দ্বিতীয় অধ্যায়

নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ

এই অধ্যায়ে মহারাজা নিমি এবং নয়জন যোগেন্দ্রের মধ্যে আলোচনার পুরানো ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে শ্রীনারদ মুনি বিশ্বস্ত এবং অনুসন্ধিৎসু বসুদেবের কাছে ভাগবত-ধর্ম বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের বিপুল লালসা নিয়ে দেবর্ষি নারদ দ্বারকাতেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করতেন। শ্রীভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে বসুদেব এক সময়ে ভগবান অনন্তদেবের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন যাতে তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন, কিন্তু তিনি মুক্তিলাভের জন্য আরাধনা করেননি।

একদা নারদ মুনি বসুদেবের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন বসুদেব তাঁকে যথার্থ ভব্যতা সহকারে অর্চনা করেন, সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানান এবং সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্তিপ্রদায়ী শুদ্ধ প্রেমভক্তি সেবার কথা তাঁর কাছ থেকে শোনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বসুদেবের দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করে শ্রীনারদ তখন তাঁকে বিদেহ প্রদেশের রাজা নিমির সঙ্গে ভগবান শ্রীঋষভদেবের ন'জন পুত্র যোগেন্দ্রগণের সাথে আলাপচারিতার সুপ্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত। তাঁর পুত্র ছিলেন আগ্নীধ্র, তাঁর পুত্র ছিলেন নাভি। বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান শ্রীঋষভদেব ছিলেন নাভির পুত্র। ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন শ্রীনারায়ণের পরম ভক্ত ভরত, যাঁর নামানুসারে এই পৃথিবীর পূর্বনাম অজনাভবর্ষ পরিবর্তন করে 'ভারতবর্ষ' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। ঋষভদেবের অন্য ন'জন পুত্র 'নব-যোগেন্দ্র' নামে প্রখ্যাত ছিলেন, তারা—কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, এবং করভাজন। তাঁরা আত্মবিদ্যাবিশারদ, জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সদাসর্বদা সিদ্ধিলাভের অন্বেষণে আবিষ্ট ছিলেন। ঋষভদেবের অন্য ন'জন পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন করেন এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অধিপতি হন। তাঁর অন্য একাশিজন পুত্র স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়ে উঠে ফলাশ্রয়ী কর্মময় যাগযজ্ঞের পন্থা প্রচার করেন।

ঐ নব যোগেন্দ্রগণ অব্যাহত গতিতে বিচরণের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন বলে তাঁরা স্বেচ্ছামতো সর্বত্র ভ্রমণ করতেন। তাঁরা ছিলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান

শ্রীমধুসূদনের সাক্ষাৎ পার্ষদ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহাদির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করতেন। মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হলেও তা অতি দুর্লভ প্রাপ্তিও বটে। সেই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করে থাকার সময়ে বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়ভক্ত সমাজের সঙ্গলাভ করা আরও দুর্লভ। ঐ শ্রেণীর সাধুগণের সঙ্গলাভ ক্ষণার্ধের জন্য হলেও তার মাধ্যমে জীবের সর্বকল্যাণ প্রদান সম্ভব হয়ে ওঠে। সেই কারণে রাজা নিমি নব যোগেন্দ্রবর্গকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদের অর্চনা বিধান করে বিনয় সহকারে প্রণিপাত নিবেদন করে তাঁদের কাছ থেকে ভাগবত-বিধান বিষয়ক ধর্মকথা শ্রবণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ভাগবত-ধর্ম তথা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমভক্তি নিবেদনের পন্থাই একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে জীবাত্মার পরম সৌভাগ্য অর্জনের সন্ধান পাওয়া যায়। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের সেবায় প্রীত হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন।

নিমিরাজার প্রশ্নের উত্তরে নব-যোগেন্দ্রগণের অন্যতম, যাঁর নাম কবি, তিনি বলেন, "পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং পারমার্থিক উন্নতি লাভের এই যে সমস্ত উপায় বর্ণনা করেছেন, সেগুলি পালন করলে নির্বোধ মানুষেরাও অনায়াসে পরিশুদ্ধ আত্ম উপলব্ধির পথ খুঁজে পেতে পারে, সেই উপায়টিকেই বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। চিরস্থায়ী অবিনাশী শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবারূপে এই যে ভাগবত-ধর্ম প্রতিভাত হয়েছে, তা সকল জীবের পক্ষেই সর্বপ্রকার ভয় নিবারণে সক্ষম। ভাগবত-ধর্ম পালন করে চলতে থাকলে, মানুষ দু'চোখ বন্ধ করে চলার সময়েও তার কোনও পদস্খলন বা পতন ঘটে না। মানুষ তার দেহ, মন, বাক্য, বুদ্ধি, চিত্ত, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং স্বভাবজাত প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে যা কিছু করে থাকে, তা সবই ভগবান শ্রীনারায়ণেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা উচিত। শ্রীভগবানের চরণকমলে আত্মনিবেদনে বিমুখ জীবগণ শ্রীভগবানেরই মায়াশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভগবৎ-সত্তা বিস্মৃত হয় এবং নিজের অস্থায়ী দেহসত্তার প্রতি জড়জাগতিক আসক্তির ফলে দেহাত্মবুদ্ধির মাঝে আবদ্ধ হয়েই থাকে। জড়জাগতিক নানা প্রকার আসক্তির বশবর্তী হয়ে, তারা নিত্য ভয়ভীত হয়ে জীবন কাটায়। এই কারণেই কোনও একজন সদগুরুর কাছে তাদের সমগ্র প্রাণমন সত্তা সমর্পণ করে শুদ্ধভক্তি সহকারে মায়ার সর্বময় অধিকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা-অর্চনা অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। আহার করার ফলে যেমন মানুষের ক্ষুধা ক্রমশ নাশ হতে থাকে এবং প্রত্যেক গ্রাস আস্বাদনের মাধ্যমে আরও আরও তুষ্টি আর পুষ্টি অনুভব করা যায়, তেমনভাবেই শ্রীভগবানের চরণকমলে

আত্মসমর্পিত ভক্তও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সকল বিষয় থেকে ক্রমশ নিরাসক্তি অর্জন করার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের প্রত্যক্ষ আস্বাদন একাদিক্রমে উপলব্ধি করতে থাকে।"

তারপরে অন্যতম যোগেন্দ্র হবিঃ ক্রমশ উত্তম, মধ্যম, এবং প্রাকৃত পর্যায়ের ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন লক্ষণাদি বর্ণনা করে বলেছিলেন, "যিনি শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহে শ্রদ্ধাসহকারে বিধিপূর্বক পূজা অর্চনা নিবেদন করেন, কিন্তু বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি এবং বিষ্ণুবিষয়ক অন্য কোনও বিষয়ে ভক্তিভাব পোষণ করেন না, তিনি জড়জাগতিক ভাবাপন্ন প্রাকৃত ভক্ত। যিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি প্রদর্শন করেন, ভগবদ্ভক্তদের প্রতি সখ্যতা অবলম্বন করেন, এবং শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবজনের বিদ্বেষীদের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। আর যে ব্যক্তি সর্ববিষয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অধিষ্ঠান দর্শন করেন এবং শ্রীভগবানের মধ্যেই সব কিছুর অবস্থান উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি উত্তম ভক্ত।"

উত্তম ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি আটটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, এবং সেই শ্লোকগুলির শেষ শ্লোকে উপসংহারে উল্লেখ আছে যে, উত্তম ভগবদ্ভক্ত আপন হৃদয়মধ্যে প্রণয় রজ্জু দিয়ে শ্রীভগবানকে সর্বক্ষণ বন্ধন করে রাখেন। ভগবান শ্রীহরিও তেমন ভক্তের হৃদয় পরিত্যাগ কখনও করেন না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব বললেন; **গোবিন্দ**—ভগবান শ্রীগোবিন্দের; **ভুজ**—হাত দিয়ে; **গুপ্তায়াম্**—সুরক্ষিত; **দ্বারবত্যাং**—দ্বারকাপুরীতে; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **অবাৎসীৎ**—বাস করতেন; **নারদঃ**—শ্রীনারদ মুনি; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **কৃষ্ণ-উপাসন**—শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় নিয়োজিত; **লালসঃ**—আকুলভাবে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের লালসা নিয়ে শ্রীনারদমুনি নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নিরন্তর বাস করতেন।"

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি ভক্তি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু বসুদেবের কাছে ভাগবত ধর্ম তথা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। রাজা নিমি

এবং জায়ন্তদের মধ্যে এক আলাপ-আলোচনা শ্রীনারদ মুনি উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *অভীক্ষ্ণং* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শই শ্রীনারদ মুনিকে এখানে-সেখানে বিবিধ লীলাপ্রসঙ্গে, যথা—বিশ্বপ্রসঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠালেও, শ্রীনারদ মুনি বারে বারেই দ্বারকায় বসবাসের জন্য কেবলই ফিরে আসতেন। *কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর উপাসনায় শ্রীনারদ অতীব আগ্রহী ছিলেন। দক্ষরাজের অভিশাপের ফলে, শ্রীনারদ কখনই এক জায়গায় অধিক সময় অবস্থানের সুযোগ পেতেন না। অবশ্য শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ন তস্যাৎ শাপাদেঃ প্রভাবঃ* —দ্বারকাধামে কোনও প্রকার অভিশাপ কিংবা অন্য কোনও প্রকার মন্দভাগ্যের প্রভাব কার্যকরী হয় না, কারণ দ্বারকা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধাম এবং *গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং* শব্দের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেই ধামটি নিরন্তর শ্রীগোবিন্দ স্বহস্তে সুরক্ষিত রেখেছেন।

জন্ম, মৃত্যু, জরা (বার্ধক্য) এবং ব্যাধির মতো জড় জাগতিক প্রকৃতির নির্মম নিয়মাধীন হয়ে মায়ার রাজ্যে বদ্ধ জীবেরা সংগ্রাম করে চলেছে। তবে জড় জাগতিক নিয়মাবদ্ধ সেই বদ্ধ জীবেরা যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দ্বারকা, মথুরা কিংবা বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে, এবং সেখানেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিময় বাহুগুলির প্রত্যক্ষ সুরক্ষাধীনে বসবাস করে, তাহলে তারা নিত্য সত্য এবং শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সঙ্গ সুখের মাঝে অতিবাহিত করবার যথার্থ জীবনধারার অনন্ত চিন্ময় সুখ উপলব্ধি করবে।

শ্লোক ২

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥ ২ ॥

কঃ—কে; **নু**—অবশ্য; **রাজন্**—হে রাজা; **ইন্দ্রিয়বান্**—ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন; **মুকুন্দচরণ-অম্বুজম্**—ভগবান শ্রীমুকুন্দের চরণকমল; **ন ভজেৎ**—ভজনা না করে; **সর্বতঃ-মৃত্যুঃ**—সর্বতোভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন; **উপাস্যম্**—উপাসনার যোগ্য; **অমর-উত্তমৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্! জড় জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বদ্ধ জীবগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। তাই, মহান্ মুক্তপ্রাণ শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদেরও উপাস্য ভগবান শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দে কোন্ প্রাণী আরাধনা না করে থাকতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির মধ্যে *ইন্দ্রিয়বান্* শব্দটি উল্লেখযোগ্য অর্থবাহী। *ইন্দ্রিয়বান্* মানে 'ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন'। যদিও আমরা জড়জগতের মাঝে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছি, তবু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় একটি মানবদেহ আমরা লাভ করেছি, যাতে চোখ, কান, জিভ, নাক এবং দেহত্বকের মতো সুস্পষ্ট অনুভূতিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদি রয়েছে। সাধারণত বদ্ধ জীবেরা ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে জড়া প্রকৃতিকে করায়ত্ত করবার বৃথা অপচেষ্টায় এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু আমাদের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি এবং সেইগুলির উপভোগ্য সব কিছু লক্ষ্যই অনিত্য অস্থায়ী, তাই শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রদত্ত অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রী নিয়ে আমাদের অস্থায়ী ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্ত করার চেষ্টার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি বা সুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদিকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা অবধারিতভাবেই জড়জাগতিক দুঃখভোগের মতোই ঠিক বিপরীত ফলভোগ সৃষ্টি করে থাকে। কোনও পুরুষ কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, যৌনতায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে তাকে বিবাহ করে, এবং অনতিবিলম্বে একটি পরিবার সৃষ্টি হয়, যেখানে ক্রমবর্ধমান সহযোগের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এইভাবেই মানুষটির নির্দোষ তথা সহজ সরল জীবনধারা শুকিয়ে যায়, এবং তখন সে তার জীবনের অধিকাংশই গাধার মতো কঠোর পরিশ্রম করে তার পরিবারবর্গের দাবিদাওয়া মেটাতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলমুনি সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, কোনও মানুষ তার সারাজীবন ধরে যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে থাকে, তাতেও শেষ পর্যন্ত তার পরিবারবর্গ অতৃপ্ত বোধ করতে থাকে, আর যখন পরিশ্রান্ত পিতা বার্ধ্যক্যে উপনীত হন, তখন তিতিবিরক্ত হয়ে কোনও চাষী যেভাবে বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য বলদদের বোঝা মনে করে, পরিবার পরিজন তাঁকে সেইভাবেই আচরণ করতে থাকে। কখনও বা ছেলেরা তাদের বাবার টাকা পয়সা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে এবং সংগোপনে তাঁর মৃত্যু কামনা করে। আজকাল বয়োবৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য সেবাযত্নের ঝঞ্ঝাট নিতে লোকে খুবই বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে। এবং তাই কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের পাঠিয়ে দেয়, তার তথাকথিত স্নেহ ভাজনদের জন্য আজীবন কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সেখানেই তাঁরা নিঃসঙ্গভাবে এবং অবহেলার মাঝে মৃত্যুবরণ করে থাকে। ইংল্যাণ্ডের একজন ডাক্তার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রস্তাব করেছেন যে, বয়োবৃদ্ধ যে সব মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, আর কোনও কাজেই লাগে না, তাদের জন্য সহজ যন্ত্রণাহীন মৃত্যু ব্যবস্থা আরোপ করা চলে।

আজকাল কিছু লোক জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগে ইচ্ছুক হলেও গার্হস্থ্য জীবন যাপনের অসুবিধা পরিহার করে চলতে চায়, তারা বিবাহের ঝঞ্ঝাট ছাড়াই নারীদের সঙ্গে 'অবাধ' যৌন সংসর্গ উপভোগের চেষ্টা করে থাকে। জন্মনিরোধ এবং গর্ভপাতের মাধ্যমে তারা ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের দায়দায়িত্ব পরিহার করে। এইভাবে তারা কোনও জড়জাগতিক বাধাবিপত্তি ছাড়াই জড় জীবনের ইন্দ্রিয় উপভোগ চরিতার্থতার আশা করে থাকে। অবশ্য প্রকৃতির নিয়মবিধি অনুসারে, ঐ ধরনের মানুষেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাদের যথাযথ কর্তব্য পালনে অবহেলার জন্য এবং নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্য সকলের প্রতি নির্বিচারে হিংসামূলক ও কষ্টদায়ক পাপময় কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই পড়ে। অধার্মিক কার্যকলাপের জালে আবদ্ধ হয়ে তারা ক্রমশই তাদের সহজাত শুদ্ধ চেতনা থেকে পথভ্রষ্ট হয় এবং প্রকৃতির বিধিনিয়মগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার সমস্ত সামর্থ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে।

তাই এখানে বলা হয়েছে *সর্বতোমৃত্যুঃ*। *মৃত্যু* মানে 'মরণ'। এই মৃত্যু অকস্মাৎ এসে ঐসব দুঃসাহসী ইন্দ্রিয়ভোগী মানুষদের হতচকিত করে দেয়, এবং তাদের জাগতিক সুখ ভোগের সমস্ত কার্যক্রম বানচাল করে দেয়। প্রায়শই ঐ ধরনের মানুষরা বীভৎস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং অকল্পনীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে, যা থেকে মৃত্যু হয়।

যদি কোনও সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব বিষয়গুলি তাকে বুঝিয়ে বাস্তব পরিণামের কথা বলতে চেষ্টা করে, তাহলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাকে হতাশাবাদী কিংবা কুসংস্কারধর্মী বলে তাকে অপবাদ দিতে থাকে। এইভাবে তারা অন্ধভাবে প্রকৃতির বিধিনিয়মাদি লঙ্ঘন করতেই থাকে, যতক্ষণ না এই বিধি নিয়মাদির ফলেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ তাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনার রাজ্য থেকে অধঃপতন ঘটে। পাপময় কর্মফলের অত্যধিক গুরুভারে তারা যথানিয়মেই গভীর দুঃখকষ্টময় পরিস্থিতির মাঝে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ক্রমশ জীবনের নিকৃষ্টতর প্রজন্মের স্তরে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলির ঊর্ধ্বে যে সমস্ত সচেতনতা রয়েছে, তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে থাকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে জড় জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের শোচনীয় পরিণামের বিষয়টি জীবের উপলব্ধি হয়ে থাকে। তখন জড় জাগতিক জীবনের দুঃখ কষ্টে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং অন্য কোনও উচ্চ পর্যায়ের জীবনধারা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে, মানুষ নব্য-বৌদ্ধ দর্শনচিন্তার আশ্রয় নেয় এবং শূন্যবাদ বলতে যা বোঝে, তার মাঝে শান্তি খোঁজে।

কিন্তু শ্রীভগবানের রাজ্যে তো বাস্তবিকই কোথাও শূন্যতা নেই। জড় জাগতিক দুঃখকষ্টের সামনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শূন্যতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে, এটা কোনক্রমেই পরমেশ্বরের যথার্থ ভাবধারা নয়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমার পায়ে আমি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি এবং যন্ত্রণার চিকিৎসা না করা যায়, তবে আমি শেষ পর্যন্ত আমার পা কেটে বাদ দিতে রাজী হতে পারি। কিন্তু যন্ত্রণা দূর করে আমার পা ঠিক রাখাই সব চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত।

ঠিক তেমনই, মিথ্যা অহংকারের ফলে আমরা মনে করি, "আমিই সব বুঝি। আমিই সবার চেয়ে দরকারি লোক। অন্য কেউই আমার মতো বুদ্ধিমান নয়।" এইভাবে চিন্তা করে, আমরা অবিরাম কষ্ট পাই এবং গভীর উদ্বেগে কষ্ট ভোগ করি। কিন্তু যখনই আমরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে স্বীকার করে আত্মশুদ্ধি লাভ করি, তখনই আমাদের অহমিকা গভীর তৃপ্তি লাভ করে।

বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত পরমানন্দময় বিচিত্র চিন্ময় আকাশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগে মগ্ন রয়েছেন। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দের উৎস। জাগতিক তৃপ্তি সুখভোগে মগ্ন মানুষেরা সর্বব্যাপী মৃত্যুর বিধিনিয়মে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু যদি আমরা তার পরিবর্তে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করি, তবে আমরা অচিরেই তাঁর হ্লাদিনীশক্তি তথা পরমানন্দময় সত্তার মাঝে সংযোগ লাভ করতে পারি। আমরা যদি তাঁর প্রামাণ্য প্রতিভূ স্বরূপ কোনও সদগুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি, তবে অচিরেই আমরা জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। তখন আমরা অযথা শূন্যতার পিছনে ধাবমান না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অপরিমেয় চিন্ময় সুখ আস্বাদন করতে সক্ষম হব।

সর্বতোমৃত্যুঃ কথাটি আরও বোঝায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহেই জন্ম এবং মৃত্যু হয়ে থাকে। তাই আমাদের মহাকাশ ভ্রমণ এবং মহাশূন্যের চেতনতা সম্পর্কে ধারণা সবই বৃথা, যেহেতু জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নিত্যসত্য জীবনের অস্তিত্ব নেই।

পরিশেষে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যা কিছুর সেবায় আত্মনিয়োগের ব্যর্থতা উপলব্ধি করা এবং যা কিছু নিত্য সত্য আর আনন্দময়, তারই সেবায় আত্মনিবেদন করার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করাই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পরম সম্ভাবনা বলে স্বীকার করতে হয়। যদিও আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কীর্ণ, কারণ তা প্রকৃতির নিয়মাধীন, তা সত্ত্বেও কোন্‌টি অস্থায়ী আর অপ্রয়োজনীয় আর কোন্‌টি নিত্যসত্য এবং যথার্থ, তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শিখে শ্রীমুকুন্দের চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেই আমরা অসামান্য সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব।

শ্লোক ৩

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্ ।
অর্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে; **একদা**—এক সময়ে; **তু**—এবং; **দেব-ঋষিম্**—দেবর্ষি নারদ; **বসুদেবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জনক বসুদেব; **গৃহ-আগতম্**—গৃহে এসেছিলেন; **অর্চিতম্**—পূজিত হয়েছিলেন; **সুখম্ আসীনম্**—সুখে উপবেশন করেছিলেন; **অভিবাদ্য**—তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন জানিয়ে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রীনারদ মুনিকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-অর্চনা জানিয়ে, তাঁকে সুখে উপবেশন করিয়ে, বিনীতভাবে প্রণাম নিবেদনের পর বসুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীবসুদেব উবাচ

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্ ।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—শ্রীবসুদেব বলেছিলেন; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ভবতঃ**—আপনার মতো মহাত্মা; **যাত্রা**—আগমন; **স্বস্তয়ে**—কল্যাণের জন্য; **সর্বদেহিনাম্**—সকলের জন্য; **কৃপণানাম্**—অতীব হীনজনেরও; **যথা**—যেমন; **পিত্রোঃ**—পিতার মতো; **উত্তম-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে অতি উত্তম শ্লোকাদির মাধ্যমে বন্দনা করা হয়ে থাকে; **বর্ত্মনাম্**—সেই অভিমুখে যাদের যাত্রা সুনিশ্চিত।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—হে প্রভু, সন্তানদের কাছে পিতার পরিদর্শনের মতো আপনার এই পরিদর্শন সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত। ভগবান উত্তমশ্লোকের মার্গগামী উত্তম ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে মহা কৃপণগণকেও আপনি বিশেষরূপে সহায়তা প্রদান করেন।

তাৎপর্য

বসুদেব এখানে শ্রীনারদ মুনির মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। *কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃ শ্লোকবর্ত্মনাম্* কথাগুলি বিশেষ অর্থবহ। *কৃপণানাম্* বলতে বোঝায় অতীব হীনজন, আর *উত্তম শ্লোকবর্ত্মনাম্* বোঝায় বিবিধ শ্রেষ্ঠ শ্লোক দ্বারা বন্দিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি ভক্তিমার্গে যাঁরা প্রাগ্রসর হয়ে অতীব সৌভাগ্যবান। শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন, *তথা ভগবদ্রূপস্য ভবতো যাত্রা সর্বদেহিনাং স্বস্তয় ইতি*। *ভগবদ্রূপস্য* কথাটি বোঝায় যে, শ্রীনারদমুনি হলেন পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশপ্রকাশ, তাই তাঁর কার্যকলাপ সর্বজীবের পরম কল্যাণ সাধন করে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে শ্রীনারদ মুনিকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপার সাক্ষাৎ অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি সেবা নিবেদনের রীতিনীতি সম্পর্কে শ্রীনারদমুনি বিশেষভাবে পারদর্শী। বদ্ধজীবেরা তাদের বর্তমান জীবদ্দশায় বিবিধ কর্মকাণ্ডের মাঝেই কোনও প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেও কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিচর্চার কার্যক্রম সংযোজন করে নিতে পারে, সেই বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে শ্রীনারদ মুনি বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* (৩/৯/১০) থেকে উদ্ধৃতি সহকারে *কৃপণ* শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। *এতদ্ অক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাসমাল্ লোকাৎ পৈতি স কৃপণঃ*—"হে গর্গাচার্যের কন্যা, চির-অভ্রান্ত পরমেশ্বরের কিছুই না জেনে যে জন এই জগৎ পরিত্যাগ করে, তার মতো কৃপণ আর হয় না।" অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্যকালের আনন্দময় সুসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি, তারই জন্য মানব জীবন আমাদের প্রদান করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টির দ্বিতীয় শ্লোকে তাই *ইন্দ্রিয়বান্* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা যাতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা নিবেদন করতে পারি, সেই কারণেই মানব দেহটি বিশেষভাবে আমাদের প্রদান করা হয়েছে। এই মানবদেহ মহা সৌভাগ্যের পরিচয়, কারণ মানবজীবনের অতীব পরিমার্জিত বুদ্ধিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের পরম তত্ত্ববিষয়ক মাহাত্ম্য উপলব্ধির পক্ষে আমাদের সহায়তা করে থাকে।

শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্যকালের যে সম্পর্ক, আমরা বুঝতে অক্ষম হলে, এই ইহজীবনের কোনই স্থায়ী সুফল অর্জনে আমরা সক্ষম হব না, এমনকি অন্য সকলকেও শেষ অবধি কোনও প্রকারে মঙ্গলময় করতে পারব না। যারা বিপুল সম্পদ অর্জন করেও তা নিজের কল্যাণে কিংবা অপরের হিতার্থে উৎসর্গ করতে পারে না, তাকেই কৃপণ বলা হয়ে থাকে। তাই, যারা শ্রীভগবানের দাসস্বরূপ সেবকরূপে আপন যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি না করে এই জগৎ পরিত্যাগ করে, তারা নিতান্তই কৃপণ।

এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেবাভক্তি নিবেদনে শ্রীনারদ মুনি এমনই শক্তিধর যে, তিনি অতীব কৃপণ স্বভাব দুর্জনদেরও তাদের

মোহগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারেন, যেভাবে কৃপাময় পিতা তাঁর সন্তানের কাছে গিয়ে তাকে ভয়াবহ দুঃখজনক দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তোলেন। আমাদের বর্তমান জড় জাগতিক জীবনধারাও ঠিক একটি বিরক্তিকর দুঃস্বপ্নেরই মতো, যা থেকে শ্রীনারদ মুনির মতো মহাত্মাগণ আমাদের জাগরিত করতে পারেন।

শ্রীনারদ মুনি এমনই শক্তিধর যে, ইতিমধ্যে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনে প্রাগ্রসর হয়েছেন, তাঁরাও শ্রীনারদের পরামর্শাদি শ্রবণ করে বিপুলভাবে তাঁদের পারমার্থিক মর্যাদার বৃদ্ধি বিকাশ করতে পারেন—যে সকল পরামর্শাদি *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের এই অংশটিতে প্রদান করা হবে। সুতরাং যে সমস্ত জীব মূলত ভগবদ্ভক্ত কিন্তু যারা এখনও মানুষ, পশু ইত্যাদি জড়জাগতিক দেহমধ্যে থেকে জড় জাগতিক পৃথিবীকে ভোগ করার কৃত্রিম অপচেষ্টা করছে, শ্রীনারদমুনি তাদের সকলেরই গুরু এবং পিতার মতো কল্যাণময়।

শ্লোক ৫

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

ভূতানাম্—জীবগণের; **দেবচরিতম্**—দেবতাদের আচরণ; **দুঃখায়**—দুঃখদায়ক; **চ**—এবং; **সুখায়**—সুখদায়ক; **চ**—এবং; **সুখায়**—সুখকর; **এব**—মাত্র; **হি**—অবশ্য; **সাধূনাম্**—সাধুবর্গের; **ত্বাদৃশাম্**—আপনাদের মতো; **অচ্যুত**—চির অভ্রান্ত পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মনাম্**—তাঁদেরই আপন আত্মা স্বরূপ স্বীকার করেছেন।

অনুবাদ

দেবতাদের আচরণে প্রাণীদের জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ই ঘটে থাকে, কিন্তু আপনার মতো মহর্ষিদের কার্যকলাপের ফলে সকল জীবেরই সুখ উৎপাদন হয়, কারণ আপনারা চির অভ্রান্ত শ্রীভগবানকেই আপনাদের একাত্মস্বরূপ স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীনারদের মতো শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেবতাদের অপেক্ষাও মহত্ত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১২) বলা হয়েছে—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

"যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা জীবনের বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়সামগ্রীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূস্বরূপ তা থেকে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় প্রদান করে থাকেন। কিন্তু অবশেষে এই সমস্ত কৃপালব্ধ সামগ্রী দেবতাদের প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যার্পিত না হলে অবশ্যই জীবমাত্র চৌর্য অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দেবতাদের সম্পর্কে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন, "দেবতারা জড় জাগতিক বিষয়াদির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরীরের বিভিন্নাংশরূপে অগণিত সহযোগী স্বরূপ দেবতাদের কাছে জল, আলো, বাতাস এবং অন্যান্য সকল কৃপা গচ্ছিত করা আছে, যা দিয়ে শ্রীভগবানের অগণিত সহযোগীরূপে দেবতারা সমস্ত জীবের শরীর এবং আত্মার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। মানুষের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সেই সকল দেবতাদের সন্তোষ এবং অসন্তোষ নির্ধারিত হয়ে থাকে।"

অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবানেরই ব্যবস্থাক্রমে, দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধানের ওপরেই জড়জাগতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে থাকে। যদি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অনীহা কিংবা অবহেলার ফলে দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন, তা হলে তাঁরা মানবজাতির ওপরে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট আরোপ করেন। সাধারণত জড় জাগতিক আবশ্যকতাগুলির অত্যধিক কিংবা অপ্রতুল সৃষ্টি-সরবরাহের রূপ নিয়েই এই সকল দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূর্যকিরণ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু যদি সূর্য থেকে অত্যধিক তাপ কিংবা অতি অল্প তাপ আসে, তখন আমরা কষ্ট পাই। অত্যধিক কিংবা অত্যল্প বৃষ্টিপাতের ফলেও দুঃখ-কষ্ট লাভ হয়। এইভাবে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সার্থকতা অনুসারেই মানবজাতির ওপরে দেবতাগণ সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে থাকেন।

অবশ্য, এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীনারদমুনির মতো মহাত্মা ব্যক্তিরা সর্বদাই সকল জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে থাকেন।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

"সাধুর লক্ষণ এই যে, তিনি সহনশীল, কৃপাময় এবং সর্বজীবের সুহৃৎ। তাঁর কোনও শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সকল প্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২১)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটির তাৎপর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে সাধুর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"উপরে যে সাধুর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ভগবানের

ভক্ত। তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা—জীবের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা। সেটাই তাঁর করুণা। তিনি জানেন, ভগবদ্ভক্তি ছাড়া মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্ত পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করেন, "কৃষ্ণভক্ত হও, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হও। শুধুমাত্র পশুসুলভ প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করে তোমাদের জীবন নষ্ট করো না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি করা অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা।"

"সাধু এইভাবে প্রচার করেন। তিনি তাঁর নিজের মুক্তি লাভে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন না। তিনি সর্বদা অন্য সকলের কল্যাণ চিন্তা করেন। সমস্ত অধঃপতিত জীবের প্রতি তিনি বিশেষ কৃপাময়। তাই তাঁর অন্যতম গুণবৈশিষ্ট্য 'কারুণিক', অর্থাৎ অধঃপতিত জীবগণের প্রতি করুণাময়। প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকার সময়ে তাঁকে বহুবিধ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাই সাধু বা ভগবদ্ভক্তকে অত্যন্ত সহনশীল হতে হয়। কখনও কেউ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে, কারণ বদ্ধজীবেরা ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই ভগবানের বাণীর প্রচার তারা পছন্দ করে না—সেটি তাদের ব্যাধি।

"এই ধরনের ভগবৎ-বিরোধী মানুষদের কাছে ভগবদ্ভক্তির উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে অনলসভাবে সাধুরা প্রশংসার আশা না করেই কাজ করে চলেন। কখনও বা ভক্তদের শারীরিক নির্যাতন তথা আক্রমণ করাও হয়ে থাকে। যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। হরিদাস ঠাকুরকে বাইশটি বাজারের মধ্যে চাবুক মারা হয়েছিল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সহযোগী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জগাই এবং মাধাই প্রহারও করেছিল।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তা সহ্য করেছিলেন, যেহেতু পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করাই তাঁদের মহান ব্রত ছিল। সাধুর অন্যতম গুণবৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হন অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং অধঃপতিত সমস্ত জীবকুলের প্রতি কৃপাময়। তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কৃপাময় হয়ে থাকেন। তিনি কেবলমাত্র মানব সমাজেরই কল্যাণকামী, তা নয়—তিনি পশু সমাজেরও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। এখানে বলা হয়েছে যে, *সর্বদেহিনাম্* অর্থাৎ জড়জাগতিক দেহধারী সকল প্রাণীর প্রতিই সাধুরা কল্যাণকামী হন। কেবল মানুষই জড়জাগতিক শরীর পেয়েছে, তা নয়, কুকুর, বেড়ালের মতো প্রাণীরাও জড়জাগতিক দেহ লাভ করেছে। কুকুর, বেড়াল, গাছপালা প্রভৃতি সকলের প্রতি ভগবদ্ভক্ত কৃপাময় হয়ে থাকেন। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি এমনভাবে আচরণ করেন যাতে তারা শেষ অবধি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম শিবানন্দ সেন তাঁর দিব্য আচরণের মাধ্যমে একটি কুকুরকে পর্যন্ত মুক্তিপ্রদান করতে পেরেছিলেন। সাধুসঙ্গের ফলে কুকুরেরও ইহজীবনের দুঃখবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বহু দৃষ্টান্ত আছে, কারণ সাধুজন সমস্ত জীবের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারের ব্রত সাধনে আত্ম নিয়োজিত থাকেন। যদিও সাধুব্যক্তি কারও প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকেন না, তা সত্ত্বেও এই জগৎ এমনই অকৃতজ্ঞ যে, কোনও সাধুব্যক্তিরও অনেক শত্রু হয়ে যায়।

"শত্রু এবং মিত্রের মধ্যে কী পার্থক্য? সেটি নিতান্তই আচরণের পার্থক্য মাত্র। বদ্ধ জীবগণের জড়জাগতিক বন্ধন মোচনের জন্যই সাধুগণ তাদের সঙ্গে যথাযথ কৃপাময় আচরণ করে থাকেন। তাই বদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য সাধুর চেয়ে বড় কোনও বন্ধু হতে পারে না। সাধুর স্বভাবই শান্ত। তিনি শান্তভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাস্ত্রাদির বিধিনিয়ম পালন করে থাকেন। সাধু বলতে বোঝায়—যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন এবং যিনি শ্রীভগবানের ভক্ত। যিনি বাস্তবিকই শাস্ত্রাদির নির্দেশ পালন করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত হয়ে থাকেন। কারণ পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করতে সমস্ত শাস্ত্রেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সাধু বলতে বোঝায়—যিনি শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি মেনে চলেন এবং একজন ভগবদ্ভক্ত। এই সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্য ভক্তজনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে দেবতাদের মতোই সদ্‌গুণাবলী প্রতিভাত হতে দেখা যায়, অথচ ভগবদ্বিদ্বেষী লোকেরা যতই বিদ্যাবুদ্ধিতে গুণবান হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক উপলব্ধির দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করলে বাস্তবিকই তাদের কোনও সদ্‌গুণাবলী কিংবা কল্যাণকর যোগ্যতা থাকে না।"

সুতরাং বসুদেব 'সাধু' শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রীনারদ মুনির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার প্রয়াস করেছিলেন, যাতে বোধগম্য হয় যে, দেবতাদের চেয়েও ভগবদ্ভক্তের মর্যাদা অনেক বেশি।

শ্লোক ৬

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্ ।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৬ ॥

ভজন্তি—ভজনা করে; **যে**—যারা; **যথা**—যেভাবে; **দেবান্**—দেবতাদের; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **অপি**—ও; **তথা এব**—ঠিক সেই মতো; **তান্**—তাদের; **ছায়া**—ছায়া; **ইব**—মতো; **কর্ম**—জড় জাগতিক কর্ম এবং তার ফলাফল; **সচিবাঃ**—কর্মীগণ; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **দীন-বৎসলাঃ**—পতিত জনের প্রতি কৃপাময়।

অনুবাদ

মানুষ যেভাবে দেবতাদের আরাধনা করে, দেবতারাও সেইভাবে অনুরূপ ফল প্রদান করে থাকেন। মানুষের ছায়ার মতোই, দেবগণও কর্মের তারতম্য অনুসারে কৃপা করেন, কিন্তু সাধুগণ বাস্তবিকই সকল ক্ষেত্রেই পতিত দীনজনের প্রতি কৃপাময় থাকেন।

তাৎপর্য

ছায়েব কর্মসচিবাঃ শব্দ কয়টি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। *ছায়া* মানে 'প্রতিরূপ'। শরীরের ছায়া যথাযথভাবেই শরীরের গতিপথ অনুসরণ করে থাকে। শরীরের গতিপথের ভিন্নদিকে চলবার কোনও ক্ষমতা ছায়ার থাকে না। ঠিক সেইভাবেই এখানে বলা হয়েছে যে, *ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্*—দেবতাগণ জীবদের যা কিছু ফলাফল প্রদান করে থাকেন, সেই সবই জীবগণের কর্মফলের যথার্থ অনুরূপ হয়েই থাকে। কোনও জীবকে সুখ এবং দুঃখ দিতে হলে যথার্থভাবে তার বিশেষ কর্ম প্রক্রিয়া অনুযায়ী তা করবার জন্যই দেবতাগণ শ্রীভগবানের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। ছায়া যেমন স্বেচ্ছায় চলতে পারে না, দেবতারাও তেমনই স্বেচ্ছামতো জীবকে শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারেন না। যদিও পৃথিবীতে দেবতারা মানুষের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণে বেশি শক্তিমান, তবু শেষ পর্যন্ত শ্রীভগবানেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দাসমাত্র, যাদের শ্রীভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তার ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীভগবানের অন্যতম এক শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীপৃথু মহারাজ বলেছেন যে, দেবতারাও যদি শ্রীভগবানের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁরাও শাস্তি ভোগের যোগ্য হন। অপরপক্ষে, নারদ মুনির মতো ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের ফলপ্রদ প্রচারকার্যের মাধ্যমে কোনও জীবের কর্মযোগের মধ্যে তাকে উপদেশ প্রদান করে তার ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম এবং বৃথা জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনে আকৃষ্ট করতেও পারেন।

জড়জাগতিক জীবনে মানুষ অজ্ঞতার অধীন হয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। তবে কেউ যদি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে এসে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপে নিজের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে, তা হলে সে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে জীবন ধন্য করতে শেখে। ঐভাবে ভক্তিসেবা নিবেদনের মাধ্যমে, মানুষ জড় জগৎ থেকে তার আসক্তি ফিরিয়ে নিতে পারে এবং তার প্রারব্ধ কর্মফলগুলি নস্যাৎ করতে পারে, আর তখন আত্মনিবেদিত জীবরূপে সে শ্রীভগবানের সেবা

কর্মে অনন্ত চিন্ময় স্বাধীনতা উপভোগের সৌভাগ্য অর্জন করে। এই সম্পর্কে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবদ্ভক্তিরসাশ্রিত সকলেরই সকাম ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের মূল অবধি যিনি দহন করে থাকেন, দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁর আশ্রিত ক্ষুদ্র কীটকেও যিনি প্রারব্ধ কর্মফলের ধারাবাহিকতা অনুসারে নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য ফল প্রদান করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের আমি ভজনা করি।" দেবতাগণও তাঁদের নিজ নিজ কর্মফলের নিয়মাধীন থাকেন, অথচ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত জড়জাগতিক ভোগ বাসনা পরিহার করার মাধ্যমে সার্থকভাবে সকল কর্মফলই ভস্মীভূত করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় ভক্তিসেবা নিবেদনে আত্মসমর্পিত জীবরূপে নিয়োজিত না থাকলে কোনও মানুষকেই যথার্থভাবে নিষ্কাম অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মসুখ সম্পর্কিত ক্রিয়াকর্ম থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত জীবরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত কোনও জড়জাগতিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দান ধ্যান তথা সর্বজনকল্যাণকর নানা ধরনের কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে থাকতে পারে এবং এই উপায়ে নিজেকে একজন স্বার্থশূন্য কর্মী বলে জাহির করতে পারে। ঠিক সেইভাবেই শ্রীভগবানের নিরাকার ব্রহ্ম সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মানসিক ক্রিয়াকর্মে নিমগ্ন হয়ে থাকে, তারাও নিজেদের স্বার্থশূন্য অথবা কামনাবর্জিত মানুষ বলে জাহির করে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অবশ্য মনে করেন যে, ঐ শ্রেণীর কর্মীরা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের 'স্বার্থশূন্যতা' বলতে যা বোঝায়, সেই ধরনের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা বাসনার দাস মাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবানের নিত্য দাস রূপে তাদের মর্যাদা তারা ঠিকভাবে বোঝেনি। সর্বজনহিতকারী কর্মী বৃথাই নিজেকে মানবসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করে, যদিও সে বাস্তবিকই অন্য কারও যথার্থ উপকার করতে অক্ষম, কারণ জড় জাগতিক অস্তিত্বের অনিত্য মায়ার বাইরেও যে নিত্য সুখ-আনন্দ এবং চিন্ময় জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে, সেই বিষয়ে সে অনভিজ্ঞ।

ঠিক তেমনই, জ্ঞানী মানুষ যেমন নিজেকেই ভগবান বলে জাহির করে এবং অন্য সকলকেও শ্রীভগবানের মতো হয়ে ওঠার ডাক দেয়, আসলে জড়া প্রকৃতির বিবিধ নিয়মের জালে ঐসব দেবতারাও কেমন করে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সে কথা সেই জ্ঞানীমানুষ বোঝাতে দ্বিধা করে।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম-ভালবাসার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেই শ্রীভগবানের মতো কোনও ধরনের মান-মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যেই কিছু কিছু মানুষ ভগবান হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সর্ববিষয়ে পরমেশ্বরের সমকক্ষ হয়ে ওঠার প্রয়াস নিতান্তই অন্য এক ধরনের জড় জাগতিক স্থূল প্রচেষ্টা তথা বাসনা মাত্র। তাই, কর্মীরা এবং জ্ঞানীরা তাদের নিজেদের বাসনাদি কৃত্রিম পন্থায় পরিপূরণের চেষ্টায় অতৃপ্ত হওয়ার ফলেই পতিত জনের প্রতি বাস্তবিকই যথার্থ কোনও দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমধ্বাচার্য *'উদ্দামসংহিতা'* উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

সুখম্ ইচ্ছন্তি ভূতানাং প্রায়োদুঃখাসহানৃণাম্ ।
তথাপি তেভ্যঃ প্রবরা দেবা এব হরেঃপ্রিয়াঃ ॥

"ঋষিগণ সকল জীবের সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন এবং প্রায়শই মানুষের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীহরির পরম প্রিয় বলেই দেবতাগণ এই বিষয়ে শ্রেয়জন।" কিন্তু যদিও শ্রীমধ্বাচার্য কৃপাময় ঋষিকুলেরও ঊর্ধ্বে দেবতাদের উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তবে শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, *সাধবঃ তু ন কর্মানুগতাঃ*—সাধুগণ বাস্তবিকই দেবতাদের চেয়েও উত্তম, কারণ সাধুরা বদ্ধজীবগণের সৎ কিংবা অসৎ সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ নির্বিশেষেই তাদের প্রতি কৃপাময় হয়ে থাকেন।

শ্রীমধ্বাচার্য এবং শ্রীজীব গোস্বামীর মধ্যে এই যে আপাতদৃষ্ট মতভেদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্যের *'ঋষি'* অর্থাৎ 'মুনি' শব্দটি কর্মী এবং জ্ঞানী মানুষদের মাঝে তথাকথিত 'সাধুব্যক্তি' বলতে যে সমস্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ রয়েছেন, তাঁদের বোঝানো হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর সকাম কর্মফললোভী কর্মী-মানুষেরা এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্ববিদেরা অবশ্যই নিজেদেরকে পবিত্র পুণ্য নীতিবাগীশ এবং জনহিতকর কর্মকাণ্ডের শিখরে বিরাজমান বলে বিবেচনা করে থাকে। তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে তারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ বলেই তারা কখনই শ্রীভগবানের ভক্তজনস্বরূপ ঐ সব দেবতাদের সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং তারা জানেও না যে, সমস্ত জীবমাত্রই শ্রীভগবানের নিত্যদাস।

এমন কি, ঐ সমস্ত দেবতাদের কখনই শ্রীনারদ মুনির মতো শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে না। ঐ ধরনের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ জীবনের চরম সার্থক সিদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে ধার্মিক এবং অধার্মিক সমস্ত বদ্ধ জীবকে পথনির্দেশ করতে সক্ষম—শুধুমাত্র ঐ সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের আদেশগুলি নিষ্ঠাভরে মেনে চললেই হয়।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্মান্ ভাগবতাংস্তব ।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও (যদিও আপনার দর্শন লাভেই আমি কৃতার্থ হয়েছি); **পৃচ্ছামঃ**—আমি প্রশ্ন করছি; **ধর্মান্**—ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে; **ভাগবতান্**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবস্থিত; **তব**—আপনার কাছ থেকে; **যান্**—যে সকল; **শ্রুত্বা**—শ্রবণের মাধ্যমে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল; **মুচ্যতে**—মুক্তি পেয়ে থাকেন; **সর্বতঃ**—সর্ব বিষয়ে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, যদিও শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্তব্যকর্ম আছে, সেইগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। যে কোনও মর্ত্যজীব শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে ঐ সকল বিষয়ে শ্রবণ করলে সকল প্রকার ভয় হতে পরিত্রাণ লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, বসুদেবকে উপদেশ প্রদানে শ্রীনারদমুনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের জনকরূপে বসুদেবের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বোধ জাগ্রত ছিল। শ্রীনারদ মুনি সম্ভবত চিন্তা করেছিলেন যে, বসুদেব যেহেতু ইতিপূর্বেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সার্থকতা অর্জন করেছেন, তাই ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। তাই, শ্রীনারদ মুনির সম্ভাব্য অনীহা অনুমান করে, বসুদেব বিশেষভাবে শ্রীনারদ মুনিকে অনুরোধ করেন—তিনি যেন কৃষ্ণভক্তি সেবামূলক বিষয়ে তার কাছে অভিব্যক্ত করেন। এটাই শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত নিজেকে কখনই মহান ব্যক্তি বলে মনে করেন না। বরং, বিনম্রভাবেই তিনি অনুভব

করে থাকেন যে, তাঁর ভক্তিসেবা অতি অসম্পূর্ণ, তবে যেভাবেই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে, ঐ ধরনের অসম্পূর্ণ সেবাও গ্রহণ করছেন। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"পথের পাশে একখণ্ড তৃণ (ঘাস) অপেক্ষাও যিনি নিজেকে দীনহীন মনে করেন, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে তিনিই পারেন। বৃথা মান-অভিমানের সকল মনোভাব বর্জন করে, অন্য সকলকে সর্ব প্রকারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মানুষকে একটি গাছের চেয়েও সহনশীল হতে হবে।" (শিক্ষাষ্টক ৩)

এই জড় জাগতিক পৃথিবীর মাঝে বদ্ধ জীবেরা তাদের পারিবারিক সূত্রে অর্জিত মর্যাদা নিয়ে বৃথাই গর্ববোধ করে থাকে। এই গর্ববোধ বৃথা, কারণ সর্বোত্তম পরিবেশে জন্ম নিলেও, জড়জাগতিক পৃথিবীতে যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তাকে অধঃপতিত অবস্থায় থাকতে হয়।

বসুদেব অবশ্যই অধঃপতিত ছিলেন না, যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত সন্তানরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা ছিলেন বলেই, তাঁর মর্যাদা ছিল সুমহান, তা সত্ত্বেও, শুদ্ধভক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ে অহঙ্কার বোধ করেননি। বরং পারমার্থিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে শ্রীনারদ মুনির মতো মহান প্রচারকের আবির্ভাবের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছ থেকে ভক্তিসেবার বিষয়ে নিয়োজিত ভক্তজনের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে চেয়েছিলেন।

নির্বিশেষবাদী নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী মানুষদের বৃথা জ্ঞানাভিমানের চেয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের অতুলনীয় বিনয়নম্র স্বভাব অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ। নির্বিশেষবাদী মানুষ নিজেকে শ্রীভগবানের সমকক্ষ মনে করে এবং নম্রস্বভাবসম্পন্ন সাধুজনের বাহ্যিক আচরণ রপ্ত করে শ্রীভগবানের মতো হয়ে উঠতে চায়।

শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু দেখলে ভয় জাগে (*দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ*)। এটি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। সব কিছুই বাস্তবিকপক্ষে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই অভিপ্রকাশ। সেই কথা *বেদান্তসূত্রে* (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) উল্লেখ করা আছে। সেই ভাবটি *ভগবদ্গীতার* মধ্যেও (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ, বাসুদেবঃ সর্বমিতি* ইত্যাদি শ্লোকে) প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকটি জীবেরই শুভানুধ্যায়ী বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)।

যদি কোনও জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে উপেক্ষা করবার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে সুনিশ্চিতভাবেই সে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার নিত্য সম্পর্কের বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠে। আত্মসমর্পিত জীব বাস্তবিকই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এবং যেহেতু সেই বন্ধুটি সকল অস্তিত্বের পরম একচ্ছত্র নিয়ন্তা, তাই, অবশ্যই, কোনও ভয়েরই কারণ নেই। ধনী মানুষের ছেলে অবশ্যই তার পিতার সম্পত্তি অবাধে ঘুরে-ফিরে দেখবার সময়ে আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি করতে থাকে।

ঠিক তেমনই, কোনও দেশের সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তার কর্তব্য সম্পাদনে ভরসা পায়। সেইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধির মতো কাজ করবার সময়ে কোনও কৃষ্ণভক্ত ভরসা বোধ করেন, কারণ তিনি প্রতিমুহূর্তে বুঝতে পারেন যে, সমগ্র জাগতিক এবং চিন্ময় সৃষ্টি সবই তাঁর কল্যাণময় প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

অবশ্যই কোনও অভক্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অস্বীকার করে এবং সে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কিছু ভিন্ন চিন্তা কল্পনা করতে থাকে। যেমন, কোনও সরকারী কর্মচারী যদি মনে করে যে, সামনে কোনও বিপজ্জনক বাধা রয়েছে, যেটি সরকারী ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে না, তখন সে ভয় পায়। যদি কোনও শিশু মনে করে যে, এমন একটি শক্তি সামনে রয়েছে, যেটি তার বাবাও সরাতে পারবে না তখন সে ভয় পায়।

তেমনই, আমরা যেহেতু কৃত্রিম চিন্তা করতে থাকি যে, সৃষ্টির মাঝে এমন কিছু আছে, যেটি কল্যাণময় ভগবানে নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, আমরা তাই ভয় পাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও দ্বিতীয় সত্তা বা বস্তুর ধারণাকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে *দ্বিতীয়াভিনিবেশ*, এবং এইটাই অচিরে ভয় নামক বাহ্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *অভয়ঙ্কর*, যার মানে তাঁর ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে সমস্ত ভয় তিনি বিনাশ করেন।

কখনও বা সুপণ্ডিত বলে অভিহিত মানুষ বহুদিন, বহু বছর ধরে নির্বিশেষবাদী নিরাকার ব্রহ্মের বিষয়ে কল্পনাবিলাস করে এবং জড় জাগতিক বিবিধ ভোগ-উপভোগের পরে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ভয়ভীত এবং উদ্বেগাকুল হয়ে দিনযাপন করতে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ধরনের সংশয়াপন্ন দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বর্ণিত আবদ্ধ শকুন পাখির তুলনা করেছেন। ভয়মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে, এই ধরনের দার্শনিক চিন্তাবিলাসীরা

দুর্ভাগ্যক্রমে কল্পনাশ্রিত মুক্তি (*বিমুক্তমানিনঃ*) লাভের ভ্রান্তিবিলাস করতে থাকেন এবং নির্বিশেষ নিরাকার চিন্ময় সত্তা বা শূন্যতার মধ্যে আশ্রয় লাভের অপচেষ্টা করেন।

কিন্তু *ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ /পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়*—যেহেতু ঐ সমস্ত কল্পনাবিলাসীরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাথে তাদের নিত্যকালের চিন্ময় সম্বন্ধ-সম্পর্কের সত্য পরিহারের মতো মূল ভ্রান্তি সংশোধন করেনি, তাই পরিশেষে তাদের কল্পিত মুক্তির পথে অধঃপতিত হয়, তার ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে দিনযাপন করতে থাকে।

অবশ্য, বসুদেব কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণে বিশেষ উদ্‌গ্রীব, তাই তিনি বলেছেন—*যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ*—শুধুমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে শ্রবণের মাধ্যমেই বদ্ধ জীব নিজেকে সকল প্রকার ভয় থেকে সহজেই মুক্ত করতে পারে, এবং এই অপ্রাকৃত মুক্তি অবশ্যই নিত্যকালের মতো লাভ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৮

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্ ।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥ ৮ ॥

অহম্—আমি; **কিল**—অবশ্য; **পুরা**—পুরাকালে; **অনন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি অনন্ত; **প্রজা-অর্থঃ**—সন্তান আকাঙ্ক্ষায়; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **মুক্তিদম্**—মুক্তিদাতা ভগবান; **অপূজয়ম্**—আমি পূজা করেছিলাম; **ন মোক্ষায়**—মোক্ষ লাভের জন্য নয়; **মোহিতো**—বিমোহিত; **দেব-মায়য়া**—শ্রীভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে আমার বিগত এক জন্মে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের আরাধনা করেছিলাম, কারণ তিনি একমাত্র মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তবে যেহেতু আমি একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তাই মুক্তি লাভের জন্য তাঁকে আরাধনা করতে পারিনি। ঐভাবে শ্রীভগবানের মায়ায় আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *কিল* (অর্থাৎ 'অবশ্যই সত্য কথা', 'বলা হয়ে থাকে', কিংবা 'সর্বজনবিদিত') শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীভগবান যখন চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুরূপে কংসের কারামধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বসুদেবকে শ্রীভগবান যা বলেছিলেন,

তা তিনি স্মরণ করছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, বসুদেবের যে উদ্বেগ *অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া* শব্দগুলির মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদুবংশের বিরুদ্ধে পিণ্ডারকের ব্রাহ্মণদের অভিশাপের কথা তিনি শুনেছিলেন এবং তিনি এই অভিশাপ থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই পৃথিবী থেকে শ্রীভগবানের অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে। বসুদেব বুঝেছিলেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে শ্রীভগবানের প্রকটলীলাবৈচিত্র্য সমাপ্ত হতে চলেছে, এবং তিনি এখন অনুতাপ ব্যক্ত করছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি কৃষ্ণভজনার সুযোগ সুবিধার উপযোগিতা সরাসরি গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তনের কোনও অবকাশ কাজে লাগাননি।

বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে বসুদেব *মুক্তিদম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। *মুক্তিদম্* কথাটি 'মুকুন্দ' নামের সমতুল্য, অর্থাৎ যে পরম পুরুষ জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জাগতিক হিসাবে দেবতাদের আয়ুষ্কাল অচিন্তনীয়ভাবেই সুদীর্ঘ হলেও তাঁরাও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ থাকেন। একমাত্র সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানই বদ্ধ জীবকে তার প্রারব্ধ পাপময় কর্মফল থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন এবং তাকে সচ্চিদানন্দময় নিত্যসুখ ও যথার্থ জ্ঞান আহরণের যোগ্য করে থাকেন।

বসুদেব আক্ষেপ করেছেন যে, চিদাকাশে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের আলয়ে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ না করে তিনি বাসনা করেছিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্ররূপে তাঁর কাছে আসেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের মধ্যে এই ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সুদৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শ্রীভগবানকে আমাদের পুত্ররূপে এই পৃথিবীর মাঝে তাঁকে নিয়ে আসার চেষ্টা না করে বরং ভগবদ্ধামে আমাদের নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়ার বাসনা করাই উচিত। তা ছাড়া আমরা সুতপা এবং পৃশ্নির মতো পূর্ব জন্মগুলিতে সহস্র সহস্র দিব্য বৎসর যাবৎ কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের ব্যর্থ অনুকরণ করতেও পারব না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "যদি আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে এই জড় জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে আমাদেরই মতো একজন মানুষের মতো পেতে চাই, তা হলে তার জন্য বিপুল সাধনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে চাই (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*), তা হলে শুধুমাত্র তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁকে

ভালবাসাই আমাদের দরকার। শুধুমাত্র প্রেম-ভালবাসার অনুশীলনের মাধ্যমেই অতি সহজেই আমরা নিজ নিকেতনে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন, যার ফলে মানুষ 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র জপকীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণধামে ফিরে যেতে পারবে। কঠোর সাধনা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কৃত্রিম প্রচেষ্টা অপেক্ষা বর্তমান যুগে এই জপকীর্তনের পদ্ধতিই বেশি ফলপ্রদ। শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত করেছেন, "তাই, বহু হাজার বছর ধরে কাউকে কঠোর সাধনার কৃচ্ছ্রসাধন করবার দরকার হয় না। মানুষকে শুধুমাত্র শিখতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে প্রেম ভালবাসা নিবেদন করতে হয় এবং ভগবৎ সেবায় সকল সময়ে নিয়োজিত থাকতে হয় (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*)। তা হলেই মানুষ অনায়াসেই নিজ আলয় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। কোনও একটি পুত্র লাভ কিংবা অন্য কোনও কিছু প্রাপ্তির আশা নিয়ে, কোনও জাগতিক উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানকে এখানে না নিয়ে এসে, তাঁকে পুত্র বা অন্য কোনওভাবে লাভের বাসনা না করে, আমরা যদি নিজ আলয়, ভগবদ্ধামে ফিরে যাই, তা হলে শ্রীভগবানের সাথে আমাদের যথার্থ সম্পর্ক-সম্বন্ধটি উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং নিত্যকালের জন্য আমাদের মধ্যে চিরন্তনী ভগবৎসম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারি। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তনের মাধ্যমে, ক্রমশ আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে আমাদের চিরকালের চিন্ময় সম্পর্ক গড়ে তুলতে শিখি আর তার ফলে *স্বরূপসিদ্ধি* নামে অভিহিত সার্থক সিদ্ধিলাভ করি। এই আশীর্বাদস্বরূপ পন্থাটির সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নিতে পারি।' (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩/৩৮ তাৎপর্য)

যদিও বসুদেব এবং দেবকী বাসনা করেছিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্র হন, তবু বুঝতে হবে যে, তাঁরা কৃষ্ণপ্রেমের উচ্চ পর্যায়ে নিত্যস্থিত ভক্তরূপে বিরাজমান ছিলেন। যেমন শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩/৩৯) *মোহিতৌ দেবমায়য়া*—তাঁর শুদ্ধ ভক্তরূপে বসুদেব এবং দেবকীকে শ্রীভগবান তাঁরই নিজ মায়াপ্রভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে (৪/১/২০) মহর্ষি অত্রি মুনি শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, *প্রজাম্ আত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছতু*—"কৃপা করে ঠিক আপনার মতো একটি পুত্র প্রদানের অনুগ্রহ করুন।" অত্রি মুনি বলেছিলেন, তিনি শ্রীভগবানেরই মতো *অবিকল* একটি পুত্র লাভ করতে চান, এবং সেই কারণেই তাঁকে শুদ্ধভক্ত বলা চলে না, কারণ তাঁর একটি বাসনা তিনি পূরণ করতে

চেয়েছিলেন আর সেই বাসনাটি ছিল জড় জাগতিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র। যদি তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে তাঁর সন্তানরূপে পেতে অভিলাষ করতেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণভাবেই জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারতেন, কারণ তিনি পরম তত্ত্বকে লাভের অভিলাষ করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অবিকল একটি শিশু পেতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর বাসনাটি জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। তাই অত্রি মুনিকে শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য করা চলে না।

বসুদেব এবং দেবকী অবশ্য স্বয়ং শ্রীভগবানকে চাননি, এবং তাই তাঁরা ছিলেন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত। এই শ্লোকটিতে এই জন্য বসুদেবের মন্তব্য *অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া* থেকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি বসুদেবকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিল যে, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র রূপেই চেয়েছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীভগবান তাঁর প্রিয়ভক্ত জনের পুত্ররূপে আবির্ভাবের পথ সুগম হয়েছিল।

শ্লোক ৯

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ ।
মুচ্যেম হ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥ ৯ ॥

যথা—যাতে; **বিচিত্রব্যসনাৎ**—বিবিধপ্রকার বিপদ-আপদে সমাকীর্ণ; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার জন্য; **বিশ্বতঃ ভয়াৎ**—(জড় জগৎ) সর্বত্রই ভয়াকীর্ণ; **মুচ্যেম**—আমি মুক্তিলাভ করতে পারি; **হি**—অবশ্য; **অঞ্জসা**—অনায়াসেই; **এব**—এমনকি; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **তথা**—তাই; **নঃ**—আমাদের; **শাধি**—কৃপা করে শিক্ষা প্রদান করুন; **সুব্রত**—যিনি প্রতিজ্ঞা মতো ব্রত সাধনে অবিচল।

অনুবাদ

হে পরম প্রিয় সুব্রতধারী, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে আপনি সর্বদাই অবিচল থাকেন। কৃপা করে সুস্পষ্টভাবে আপনি আমাকে পরামর্শ প্রদান করুন যাতে নানাবিধ বিপদসঙ্কুল এবং বিবিধ প্রকার ভয়াবহ জাগতিক পরিবেশ থেকে আপনার কৃপায় আমি মুক্তি লাভ করে অনায়াসে আপনার সঙ্গলাভে বিচ্যুত না হই।

তাৎপর্য

মুচ্যেম শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে বসুদেব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যেহেতু শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বশে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কাছ থেকে মুক্তিলাভের কৃপা অর্জন করতে পারেননি। সুতরাং তিনি এখন দৃঢ়চিত্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করছেন

যাতে ভগবদ্ভক্তের কৃপায় তিনি জাগতিক বন্ধন দশা থেকে সুনিশ্চিতভাবে মুক্তি লাভ করবেন :

এই প্রসঙ্গে *অঞ্জসা* অর্থাৎ 'অনায়াসেই', এবং *অদ্ধা* অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষভাবে' শব্দগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মূর্খ ব্যক্তিরা কোনও ভগবদ্ভক্তকে পারমার্থিক গুরুরূপে গ্রহণ তথা স্বীকার না করেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কাছে সরাসরি লাফ দিয়ে পৌঁছবার জন্য গর্বভরে উদ্যোগী হয়, সেক্ষেত্রে যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে পারদর্শী, তারা জানে যে, কোনও ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন এবং সেবার মাধ্যমেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করতে পারা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৭/২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ*। তা থেকে মানুষের বোঝা উচিত যে, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত অবশ্যই স্বয়ং ভগবানের সমান পারমার্থিক মর্যাদায় অবস্থিত থাকেন। এর মানে এই নয় যে, শুদ্ধ ভক্তও ভগবান হয়ে যান, তবে ভগবানের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ প্রেমময় সম্বন্ধের ফলে, শ্রীভগবান তাঁকে নিজেরই আত্মসম্পর্কিত বলে স্বীকার করে থাকেন। অন্যভাবে বলা চলে, শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে রয়েছেন, এবং শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকালই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি মুহূর্তের জন্যও তাঁর ভগবত্তা থেকে চ্যুত হন না। তাঁর শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা পূজিত হলে তিনি অধিকতর খুশি হন। তাই ভগবান বলেছেন, "*আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*" ভগবানের সম মর্যাদায় বৈষ্ণবগুরুকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। গুরুদেব প্রসন্ন হলে ভগবান প্রসন্ন হন এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়।

অঞ্জসা শব্দটির অর্থ এই যে, পারমার্থিক পথে অগ্রগতির অনুকূলে এটাই সহজতম প্রামাণ্য পন্থা। আর তাই শুদ্ধ ভক্ত এই বিষয়ে স্বচ্ছ মাধ্যম বলেই *অদ্ধা* অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষভাবে' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যা থেকে বোঝায় যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সেবা করলে তা একেবারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে উপনীত হয়, সেক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে কেউ সদ্‌গুরুর অবমাননা করে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত হতে গেলে তা বাস্তবিকই স্বীকৃত হয় না, তাই তা হয় ব্যর্থ।

যাঁরা বাস্তবিকই চরম সিদ্ধির স্তরে উপনীত হতে আকাঙ্ক্ষী হন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় নিজ আলয়ে ফিরে যেতে চান, তাঁদের অবশ্যই এই দুটি শ্লোকে বর্ণিত শ্রীবসুদেবের দৃষ্টান্তগুলি অতি যত্ন সহকারে অনুসরণ করতে হবে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সরাসরি উপাসনা করে মানুষ মুক্তি অর্জন করতে না পারলেও, তার জানা দরকার যে, শ্রীনারদমুনির মতো দেবতাদের মধ্যে

সুমহান বৈষ্ণব ঋষিতুল্য পুরুষদের সঙ্গে মুহূর্তকাল মাত্র সঙ্গ লাভের মাধ্যমে অতি সহজেই মানব জীবনের চরম সিদ্ধি অর্জন করতে পারে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *বিশ্বতোভয়াৎ* শব্দটি বোঝায় যে, ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে বসুদেব অত্যন্ত সমীহ করতেন। বৈষ্ণবদের আরাধনা করলে যেমন চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারা যায়, তেমনই বৈষ্ণবদের অসন্তুষ্ট করলে মানুষের সর্বাঙ্গীন দুর্ভাগ্য নেমে আসে। তাই, পিণ্ডারক তীর্থে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে বসুদেব ভয় পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা ।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজন্**—হে রাজা!; **এবম্**—এইভাবে; **কৃত-প্রশ্নো**—প্রশ্ন করার মাধ্যমে; **বসুদেবেন**—বসুদেবের দ্বারা; **ধীমতা**—বুদ্ধি; **প্রীতঃ**—প্রীতি লাভ করে; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **দেবর্ষিঃ**—দেবতাদের মধ্যে ঋষিতুল্য; **হরেঃ**—শ্রীহরি; **সংস্মারিতোঃ**—স্মরণ করিয়ে দিয়ে; **গুণৈঃ**—গুণাবলী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজা, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান বসুদেবের প্রশ্নগুলি শুনে দেবর্ষি নারদ খুশি হয়েছিলেন। কারণ সেই কথাগুলির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা আভাসিত হয়েছিল, সেইগুলির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শ্রীনারদমুনির স্মরণে এসেছিল। তাই শ্রীনারদমুনি তখন বসুদেবকে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীনারদ উবাচ

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥ ১১ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদমুনি বললেন; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **এতৎ**—এই কথা; **ব্যবসিতম্**—যথাযথভাবে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **সাত্বত ঋষভ**—হে সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যেহেতু; **পৃচ্ছসে**—আপনি প্রশ্ন করছেন; **ভাগবতান্ ধর্মান্**—পরমেশ্বর

ভগবানের প্রতি কর্তব্যাদি; ত্বম্—আপনাকে; বিশ্ব-ভাবনান্—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রকারক।

অনুবাদ

শ্রীনারদমুনি বললেন—হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের নিত্য কর্তব্য বিষয়ে আপনি যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসেবা নিবেদনের মূল্য এতই গভীর যে, তা অনুশীলনের ফলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

তাৎপর্য

অনুরূপ উক্তি শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম শ্লোকে ব্যক্ত করেছিলেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিনন্দিত করেন।

বরীয়ান্ এষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ ।
আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥

"হে মহারাজ, আপনার প্রশ্নটি মহিমান্বিত, কারণ এই প্রশ্ন সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই অতীব কল্যাণকর। এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলা যায়, তা শ্রবণের পক্ষে সর্বোত্তম বিষয়বস্তু, এবং তা সমস্ত অধ্যাত্মবাদীর অনুমোদিত।"

এইভাবেই, শ্রীল সূত গোস্বামী নিম্নোক্ত ভাষায় নৈমিষারণ্যের জিজ্ঞাসু ঋষিবর্গকেও অভিনন্দিত করেন—

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্ ।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসম্প্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"হে ঋষিবর্গ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি মূল্যবান, কারণ সেইগুলি কৃষ্ণসম্বন্ধীয়, এবং তাই বিশ্বকল্যাণের পক্ষে তা প্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র এই ধরনের প্রশ্নাদি জীবাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনে সক্ষম।"

(ভাগবত ১/২/৫)

এখন নারদমুনি ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বসুদেবের অনুসন্ধানের উত্তর প্রদান করবেন। পরে, তাঁদের বাক্যালাপের শেষে, বসুদেবের নিজ ভ্রান্ত অভিলাষাদি সম্পর্কে মন্তব্যগুলির উত্তর প্রদান করবেন।

শ্লোক ১২

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ ১২ ॥

শ্রুতঃ—শ্রবণের মাধ্যমে; **অনুপঠিতঃ**—পরে উচ্চারণের দ্বারা; **ধ্যাত**—অনুধ্যানের মাধ্যমে; **আদৃতঃ**—গভীর বিশ্বাসে গ্রহণের মাধ্যমে; **বা**—কিংবা; **অনুমোদিতঃ**—অন্য সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে প্রশংসা লাভের মাধ্যমে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পুনাতি**—পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে; **সদ্ধর্মো**—শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা; **দেব**—দেবগণের উদ্দেশ্যে; **বিশ্ব**—এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে; **দ্রুহঃ**—বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে; **অপি হি**—এমন কি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা অনুষ্ঠান এমনই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন যে, ঐ ধরনের অপ্রাকৃত পারমার্থিক সেবাধর্মের বিষয়ে শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই, সেই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে, সেই প্রসঙ্গে মনোনিবেশের মাধ্যমে, সেই সকল তথ্যাবলী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে স্বীকারের মাধ্যমে, কিংবা অন্যসকলের ভগবদ্ভক্তির কথা প্রশংসার মাধ্যমে, এমন কি যারা দেবতাদের ঘৃণা করে, তারা এবং অন্য সমস্ত জীবও অচিরে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, *সদ্ধর্ম* শব্দটি বলতে *ভাগবত-ধর্ম* বোঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামীও সমর্থন করেছেন। ভাগবত-ধর্ম এমনই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যে, জাগতিক জীবনধারায় যারা নানাভাবে পাপাচরণে জড়িত হয়ে পড়েছে, তারাও এই শ্লোকটিতে বর্ণিত যে কোনও ক্রিয়াকর্মের অভ্যাস শুরু করার মাধ্যমে অনায়াসেই শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। সাধারণভাবে দানধ্যান করার মাধ্যমে, মানুষ ভগবৎ-সেবার বিনিময়ে কোনও কিছু পেতে চায়। তেমনই, নির্বিশেষবাদী মানুষ নিজের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই সবকিছু করতে থাকে এবং চিন্তায় স্বপ্নবিভোর হয়ে থাকে যে, সে-ও শীঘ্রই ভগবানের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। অবশ্য ভাগবত-ধর্মে ঐ ধরনের কোন অশুদ্ধ প্রবণতার স্থান নেই। *ভাগবত-ধর্ম* শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভক্তিমূলক সেবাধর্ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান। যদি কেউ এই প্রক্রিয়া নস্যাৎ করে এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনও প্রক্রিয়া সম্পর্কে শ্রবণে, শিক্ষণে কিংবা চিন্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে অনতিবিলম্বে শুদ্ধতা অর্জনের সুযোগ হারিয়ে ফেলবে।

যারা পাপাচরণে অধঃপতিত হয়েছে, তাদের অচিরে শুদ্ধতা লাভের কোনও ক্ষমতাই সাধারণ জাগতিক যোগপ্রক্রিয়াদির মধ্যে নেই—কারণ ঐ যোগাভ্যাসগুলি শুধুমাত্র বিপুল জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনার সাহায্যে কিছু

আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের পক্ষেই উপযোগী হয়ে থাকে। *সদ্ধর্ম* অর্থাৎ ভাগবৎ-ধর্ম পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তি নিবেদনের প্রক্রিয়া, তাই তা অতি অনুপম এবং এই ধর্ম প্রতিপালনের মাধ্যমে অতীব পতিত জনও অচিরে শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চরণকমলে আত্মনিবেদিত হয়ে সদর্থক সিদ্ধি লাভের চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে জগাই ও মাধাই নামে দুই পাপীতাপী ভাইয়ের জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারযজ্ঞের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥ ১৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **পরম**—শ্রেষ্ঠ; **কল্যাণঃ**—কল্যাণময়; **পুণ্য**—অতি পবিত্র; **শ্রবণ**—শ্রবণ ক্ষমতার মাধ্যমে; **কীর্তনঃ**—এবং তাঁদের বিষয়ে যশোকীর্তনের মাধ্যমে; **স্মারিতঃ**—স্মরণ করার মাধ্যমে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অদ্য**—আজ; **দেবঃ নারায়ণঃ**—শ্রীনারায়ণ; **মম**—আমার।

অনুবাদ

আজ আপনি পরমানন্দময় পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান এমনই শুভময় কল্যাণপ্রদ যে, তাঁর প্রসঙ্গ যে কেউ শ্রবণ এবং যশোকীর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পুণ্যপবিত্র হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *নারায়ণস্তদ্দৃশধর্মে মদীয়গুরুরূপো নারায়ণর্ষিঃ।* এই শ্লোকটিতে *নারায়ণ* শব্দটিতে ভগবদ্-অবতার শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি এই ধর্মপ্রক্রিয়ায় শ্রীনারদের দীক্ষাগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী আরও নির্দেশ করেছেন যে, *স্মারিত ইতি কৃষ্ণোপাসনাবেশেন তস্যাপি বিস্মরণাৎ।* *স্মারিত* শব্দটির অর্থ "তিনি স্মৃতিপথে ফিরে এলেন," তা থেকে বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার ফলে নারদ অবশ্যই দেবতা নরনারায়ণকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকর্মে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকার ফলে যদি কখনও কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাপনার ফলে ঐ ধরনের নিষ্ঠাবান সেবক পরমেশ্বর ভগবানের কথা আবার স্মরণ করতে পারে।

শ্লোক ১৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
আর্যভাণাং চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

অত্র অপি—এই সম্পর্কেই (ভাগবত-ধর্ম বর্ণনা); **উদাহরন্তি**—উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত; **পুরাতনম্**—প্রাচীন; **আর্যভাণাম্**—ঋষভপুত্রগণের; **চ**—এবং; **সংবাদম্**—কথাবার্তা; **বিদেহস্য**—বিদেহ প্রদেশের রাজা জনকের সঙ্গে; **মহাত্মনঃ**—যিনি ছিলেন মহাত্মা ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মুনি-ঋষিরা মহাত্মা বিদেহরাজ জনক এবং ঋষভপুত্রগণের মধ্যে যে কথোপকথনের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তা আপনি শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

ইতিহাসং পুরাতনম্ শব্দগুলির অর্থ "প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনা" এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* যেন *নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্* অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানসমৃদ্ধ কল্পতরুর সুপক্ক ফল। সেই *ভাগবত* গ্রন্থরাজির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং বদ্ধ জীবাত্মাদের মুক্তি সম্পর্কিত যথার্থ ঐতিহাসিক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। এই সমস্ত পুরাকাহিনী কল্পনাশ্রিত গল্প-কাহিনী কিংবা পৌরাণিক কথা নয়, বরং সেইগুলি বর্তমান ক্ষীণজীবী যুগ শুরু হওয়ার আগে বহু বহু যুগে শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল, তা সবই বর্ণনা করেছে।

যদিও জড় জাগতিক ভাবাপন্ন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা হতবুদ্ধির মতোই *ভাগবতকে* পৌরাণিক কীর্তি কিংবা সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন করতে অপপ্রয়াস করে থাকে, কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* শুধুমাত্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক তথ্য-পরিবেশ সংক্রান্ত বর্ণনাই নয়, বরং এই শাস্ত্র সম্ভারের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বহু দূরে জড় জাগতিক এবং চিন্ময় আকাশে বিস্তারিত ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা করা হয়েছে।

যদি কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন-চর্চা করেন, তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে ওঠেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ, সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের মাধ্যমে অতি উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান হয়ে উঠুন এবং তারপরে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য সমগ্র জগৎব্যাপী বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রচার করুন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ, যেমন, নব যোগেন্দ্রগণ ও বিদেহরাজের

আলোচনা, পূর্ণ বিশ্বাস ও মনোনিবেশ সহকারে আমাদের শ্রবণ করা খুবই প্রয়োজন। এখন, এই অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকটিতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবেই শুধুমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের মাধ্যমেই আমরা শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মতো একই পারমার্থিক চিন্ময় মর্যাদার স্তরে উন্নীত হব। এটাই ভাগবতে বর্ণিত ইতিহাসের অসামান্য দক্ষতা, যার বিপরীত বস্তু হল বর্তমান যুগের মূল্যহীন, জাগতিক ইতিহাস বর্ণনা, যার দ্বারা শেষ পর্যন্ত কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না।

যদিও জড় জাগতিক ইতিহাসবিদগণ তাদের নিজেদের রচনাকীর্তির যৌক্তিকতা জাহির করে বলে থাকে যে, ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষালাভ করি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, পৃথিবীর অবস্থা এখন অতিদ্রুত অসহনীয় সংঘাত সংঘর্ষ এবং বিভ্রাটের মধ্য দিয়ে অবনতির দিকে অধঃপতিত হয়ে চলেছে, অথচ ইতিহাসতত্ত্ববিদ বলতে যাদের অভিহিত করা হয়ে থাকে, তারা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু ভাগবতের ইতিহাসতত্ত্বে অভিজ্ঞজনেরা বিশ্বস্তভাবে যাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করে থাকেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দময় এক পৃথিবীর পুনরুত্থানের অনুকূলে যথার্থ এবং কার্যকরী পরামর্শ দিতে পারেন। অতএব ইতিহাসের চর্চা অনুশীলনের মাধ্যমে যাঁরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবনধারার বিকাশ সাধন করতে আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ঐতিহাসিক বর্ণনা সম্ভার অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত করে তুলতে হবে। এইভাবেই তাঁদের জীবনে বুদ্ধি এবং পারমার্থিক সার্থকতা আসবে।

শ্লোক ১৫

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ব্রতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রত; **নাম**—নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **যঃ**—যাঁর; **তস্য**—তাঁর; **আগ্নীধ্রঃ**—(পুত্র ছিলেন) আগ্নীধ্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে (আগ্নীধ্র); **নাভিঃ**—রাজা নাভি; **ঋষভঃ**—শ্রীঋষভদেব; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্মৃতঃ**—স্মরণ করা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্রের নাম মহারাজ প্রিয়ব্রত, এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের পুত্র ছিলেন নাভি, যাঁর পুত্র ঋষভদেব নামে পরিচিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে ঋষভদেবের পুত্রদের কুলপঞ্জীর পটভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া ।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্ ॥ ১৬ ॥

তম্—তাঁকে; **আহুঃ**—সকলে বলত; **বাসুদেব-অংশম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বাসুদেবের অংশ; **মোক্ষ-ধর্ম**—মোক্ষধর্ম প্রবর্তনের জন্য; **বিবক্ষয়া**—প্রবর্তনের অভিলাষে; **অবতীর্ণম্**—এই জগতে আবির্ভূত; **সুত**—পুত্রগণ; **শতম্**—একশত; **তস্য**—তাঁর; **আসীৎ**—ছিলেন; **ব্রহ্ম**—বেদজ্ঞান; **পারগম্**—বিশেষভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অংশপ্রকাশরূপে শ্রীঋষভদেবকে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে সব শাস্ত্র ধর্মসম্মত বিধিনিয়মাদি সকল জীবের মুক্তির পথ সুগম করে থাকে, সেই শাস্ত্রবিধিগুলি এই জগতে প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শত পুত্র ছিল, তাঁরা সকলেই বৈদিক শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানবান ছিলেন।

শ্লোক ১৭

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **বৈ**—অবশ্য; **ভরতঃ**—ভরত; **জ্যেষ্ঠঃ**—বয়োজ্যেষ্ঠ; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত; **বিখ্যাতম্**—বিখ্যাত; **বর্ষম্**—গ্রহে; **এতৎ**—এই; **যৎ-নাম্না**—যে নামে; **ভারতম্**—ভারতবর্ষ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্য।

অনুবাদ

ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ভরতের নাম যশ অনুসারেই এখন এই গ্রহের প্রসিদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষ নামে।

শ্লোক ১৮

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্ ।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; ভুক্ত—তৃপ্ত; ভোগাম্—সকল প্রকার ভোগবিলাসে; ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে; ইমাম্—এই জগতের; নির্গতঃ—গৃহ ত্যাগ করে; তপসা—কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি; উপাসীনঃ—উপাসনা করে; তৎ-পদবীম্—তাঁর পদলাভ; লেভে—লাভ করেন; বৈ—অবশ্য; জন্মভিঃ—জন্মে জন্মে; ত্রিভিঃ—তিনটি।

অনুবাদ

রাজা ভরত এই জড় জগতের সকল প্রকার ভোগসুখই অস্থায়ী এবং অনর্থক বিবেচনা করেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ এই সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে, তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রতা সহকারে তপস্যার মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে থাকেন এবং তিন জন্মের পরে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

রাজা ভরতের তিন জন্মের বিবরণ—রাজা রূপে, হরিণরূপে এবং পরমহংস ভগবদ্ভক্ত রূপে—*শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে, সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে।

শ্লোক ১৯

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ ।
কর্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে (ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে); নব—নয় জন; নবদ্বীপ—ভারতবর্ষ সহ নয়টি দ্বীপের; পতয়ঃ—অধিপতিগণ; অস্য—এই বর্ষ তথা দ্বীপটির; সমন্ততঃ—সম্পূর্ণরূপে; কর্মতন্ত্র—বৈদিক যাগযজ্ঞের কর্মকাণ্ডে; প্রণেতারঃ—প্রবর্তকগণ; একাশীতিঃ—একাশীজন; দ্বি-জাতয়ঃ—দ্বিজ ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

ঋষভদেবের অপর নয়জন পুত্র ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন, এবং তাঁরা এই পৃথিবী গ্রহটি সম্পূর্ণ শাসনাধিকার ভোগ করতেন। একাশী জন পুত্র দ্বিজ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেবের নয়জন পুত্রের দ্বারা শাসিত নয়টি দ্বীপ তথা বর্ষের নাম—ভারত, কিন্নর, হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবর্ত, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল।

শ্লোক ২০-২১

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ ।
শ্রমণা বাতরসনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥
কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ২১ ॥

নব—নয়জন; **অভবন্**—ছিলেন; **মহাভাগাঃ**—মহাভাগ্যবান পুরুষ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **হি**—অবশ্য; **অর্থ-শংসিনঃ**—পরমতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য; **শ্রমণাঃ**—বিশেষ শ্রম উপযোগ সহকারে; **বাতরসনা**—বায়বীয় আভরণে (নির্বসনে); **আত্মবিদ্যা**—পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানে; **বিশারদাঃ**—সুশিক্ষিত; **কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ**—কবি, হবি এবং অন্তরীক্ষ; **প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ**—প্রবুদ্ধ এবং পিপ্পলায়ন; **আবির্হোত্রঃ**—আবির্হোত্র; **অথ**—এবং; **দ্রুমিলঃ**—দ্রুমিল; **চমসঃ করভাজনঃ**—চমস এবং করভাজন।

অনুবাদ

ঋষভদেবের অবশিষ্ট নয়জন পুত্র মহাপুণ্যবান, এবং পরম তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে তৎপর ছিলেন। তাঁরা দিগম্বর হয়ে নির্বসনে ভ্রমণ করতেন এবং পারমার্থিক বিজ্ঞানে অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন।

তাৎপর্য

বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্র নামে প্রখ্যাত ঋষভদেবের নয়জন ঋষিতুল্য পুত্রদের কাছে নিম্নলিখিত নয়টি প্রশ্ন করেন—(১) সর্বোত্তম কল্যাণ কি? (অধ্যায় ২, শ্লোক ৩০); (২) বৈষ্ণব, ভগবদ্ভক্ত তথা ভাগবত ব্যক্তির ধর্ম, স্বভাব, আচার, বাক্য এবং লক্ষণ কি কি? (২/৪৪); (৩) পরমেশ্বর বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাকে বলে? (৩/১); (৪) এই মায়া থেকে মানুষ কিভাবে নিস্তার লাভ করতে পারে? (৩/১৭); (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৩/৩৪); (৬) ফলভোগমূলক কর্ম, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত কর্ম, এবং নৈষ্কর্ম্য—এই তিন ধরনের কর্ম কাকে বলে? (৩/৪১); (৭) শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারগণের বিবিধ লীলাবিস্তারগুলি কি কি? (৪/১); (৮) ভগবদ্বিরোধী এবং ভক্তিহীন মানুষের কি গতি হয়? (৫/১); এবং (৯) পরমেশ্বর ভগবানের চারজন যুগাবতারের বর্ণ, আকৃতি ও নাম কি কি, এবং তাঁদের পূজাবিধি কিরূপ? (৫/১৯)

এই নয়টি পারমার্থিক প্রশ্নাবলীর সদুত্তর দিয়েছেন কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন নামে নয়জন পরমহংস

ভক্তমণ্ডলী। এই নয়জন পরমহংসের দ্বারা নয়টি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে পর পর প্রদত্ত হয়েছে—(১) ২/৩৩-৩৪; (২) ২/৪৫-৫৫; (৩) ৩/৩-১৬); (৪) ৩/১৮-৩৩; (৫) ৩/৩৫-৪০; (৬) ৩/৪৩-৫৫; (৭) ৪/২-২৩; (৮) ৫/২-১৮; এবং (৯) ৫/২০-৪২।

শ্লোক ২২

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্ ।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্ ॥ ২২ ॥

তে এতে—এই (নয়জন যোগেন্দ্র); **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রূপম্**—রূপ; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সৎ-অসৎ-আত্মকম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ সামগ্রী; **আত্মনঃ**—নিজ থেকে; **অব্যতিরেকেণ**—অভিন্নভাবে; **পশ্যন্তঃ**—দর্শন করে; **ব্যচরন্**—পর্যটন করতেন; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

এই মুনিগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক সামগ্রী সমেত পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই স্বরূপ-বিকাশ এবং নিজ সত্তা থেকে অভিন্ন উপলব্ধি করে, পৃথিবী পর্যটন করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর গোস্বামীর মতানুসারে, এই শ্লোকটিতে এবং পরবর্তী শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, ঋষভদেবের নবযোগেন্দ্র নামে অভিহিত নয়জন ঋষিতুল্য পুত্র *পারমহংস্যচরিতম্*, অর্থাৎ "সম্পূর্ণরূপে পরমহংসগণের চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ লাভ করেছিলেন"। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা ছিলেন শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ।

শ্রীধর গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামীর মতানুসারে, *আত্মনোঽব্যতিরেকেণ* শব্দগুলি বোঝায় যে, নবযোগেন্দ্র নামে পরিচিত ঋষিগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁদের আপন সত্তা হতে, এমনকি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তা হতেও অভিন্ন স্বরূপ বলে দর্শন করতেন।

এ ছাড়াও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও মন্তব্য করেছেন, *আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ অব্যতিরেকেণ বিশ্বস্য তচ্ছক্তিময়ত্বাদ্ ইতি ভাবঃ*—"আত্মনঃ বলতে বোঝায় পরমাত্মা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়, যেহেতু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই শক্তি সম্ভূত।"

যদিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশ জীবসত্তা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সত্তা থেকে অভিন্ন, তাই এমন চিন্তা করা অনুচিত

যে, জীবসত্ত্বা কিংবা পরমেশ্বর ভগবান জড় সত্ত্বা। একটি বৈদিক ভাবগর্ভ সূত্রে বলা হয়েছে, *অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*—"জীবসত্ত্বা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে জড় জাগতিক বিশ্বের কোনই সম্পর্ক নেই।"

তা ছাড়া, *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আটটি স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদান নিয়ে গঠিত *ভিন্ন প্রকৃতি* বা *অপরা প্রকৃতি*—পৃথকভাবে বিদ্যমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই নিকৃষ্ট শক্তির অভিপ্রকাশ মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সুস্পষ্টভাবেই *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর রাজ্যে তাঁর নিজ ধামে তাঁর নিত্যস্থিত ধাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে জীবন সচ্চিদানন্দময়, এবং ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই জীবসত্ত্বাও নিত্যস্থিত (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। এ ছাড়াও, সেই নিত্যস্থিত ভগবদ্ধামে একবার গেলে জীব কখনই এই অনিত্য স্থিতির মাঝে ফিরে আসে না (*যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*)।

সুতরাং কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, জীবসত্ত্বা এবং পরমেশ্বর ভগবানকে তা হলে জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে অভিন্ন বলা হয়ে থাকে কেন। প্রশ্নটির অতি চমৎকার উত্তর *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৫/২০) শ্রীল নারদ মুনি দিয়েছেন। *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরো যতো জগৎস্থান নিরোধসম্ভবাঃ*—"পরম পুরুষোত্তম ভগবানই স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এবং তা সত্ত্বেও তিনি এই সত্ত্বা থেকে ভিন্ন। তাঁর সত্ত্বা থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁরই মাঝে এই সৃষ্টি অবস্থিত রয়েছে, এবং তাঁরই মধ্যে এই সৃষ্টি ধ্বংসের পরে অন্তর্লীন হয়ে যায়।"

শ্রীনারদমুনির বক্তব্য সম্পর্কে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অতি মনোরমভাবে এই জটিল দার্শনিক বিষয়সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, "শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুকুন্দ, তথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধারণাটি সবিশেষ (সাকার) এবং নির্বিশেষ (নিরাকার) উভয় দিক থেকেই গ্রাহ্য। নিরাকার ব্রহ্মময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মুকুন্দ, কারণ সেটি মুকুন্দের আপন শক্তির অভিপ্রকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি গাছ সম্পূর্ণ একটি অস্তিত্ব, অথচ গাছটির পাতা ও ডালপালা সবই গাছটির অবিচ্ছেদ্য অংশাদিরূপে উদ্ভূত হয়েছে। গাছটির পাতা ও ডালপালাও গাছ, কিন্তু গাছটিকে তো পাতা কিংবা ডালপালা বলে স্বীকার করা যাবে না।

এই তত্ত্বের বৈদিক ভাষ্য হল এই যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্বয়ং ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ভাবধারার অর্থ এই যে, সব কিছু যেহেতু পরম ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। ঠিক সেইভাবেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাত-পা সব নিয়ে যাকে দেহ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সেই দেহটি

সামগ্রিকভাবে হাতও নয়, পা-ও নয়। তাই, শ্রীভগবান অপ্রাকৃত সৎ-চিৎ-আনন্দময়রূপ—চিরন্তনী, জ্ঞানময় এবং সুন্দর। আর সেই কারণেই শ্রীভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত সৃষ্টিও আংশিকভাবে চিরন্তন, জ্ঞানময় এবং সুন্দর বলে মনে হয়...

"বৈদিক ভাষ্য অনুযায়ী, শ্রীভগবান স্বভাবতই পূর্ণশক্তিমান, তাই তাঁর পরম শক্তিরাশি সর্বদাই যথাযথভাবে তাঁরই সমতুল্য। চিন্ময় এবং জড় জাগতিক আকাশগুলি উভয়েই এবং সেইগুলির আনুষঙ্গিক সবকিছুই শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। বহিরঙ্গা শক্তি তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট, সেক্ষেত্রে অন্তরঙ্গা শক্তি উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট শক্তি জীবের প্রাণশক্তি, আর তাই অন্তরঙ্গা উৎকৃষ্ট শক্তি শ্রীভগবানেরই সম্পূর্ণ সমভাবসম্পন্ন, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি যেহেতু অচল, তাই শ্রীভগবানের অংশত সমভাবাপন্ন। কিন্তু উভয় শক্তিই শ্রীভগবানের সমানও নয়, উচ্চতরও নয়, কারণ তিনি সকল শক্তিরই উৎস; ঐ সমস্ত শক্তিই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি, তা যতই শক্তিশালী হোক, সর্বদাই প্রযুক্তিবিদ তথা ইঞ্জিনীয়ারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকে।

"মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীব তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সৃষ্টি; তাই জীবমাত্রই শ্রীভগবানের অভিন্ন সত্ত্বা। তবে সে কখনই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ কিংবা উচ্চ পর্যায়ের হতে পারে না।"

এখানে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাজাগতিক অভিপ্রকাশ এবং জীবকুল সবই পরমেশ্বর ভগবানের অভিব্যক্তি, যেকথা *বেদান্ত সূত্র* গ্রন্থে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* সূচনাতেই *'জন্মাদ্যস্যযতঃ'* উক্তির মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে—"পরমতত্ত্ব থেকেই সব কিছু উৎসারিত হয়েছে।" তেমনই, *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

পরমেশ্বর ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্ত্বা। আর তাই যে মহাজগৎ তাঁর শক্তির অভিপ্রকাশ, সেটিও পূর্ণসত্ত্বা রূপে প্রতিভাত হয়। সেটি তাঁর পূর্ণ সত্ত্বা থেকে জড় জগৎ অভিন্ন, কারণ এই সবই সূর্যগোলক থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের মতোই অভিন্ন। সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সচেতন শক্তি রূপে সকল জীবের উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য, পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবসত্ত্বার অস্তিত্ব অভিন্ন হলেও সেটি গুণগত অভিন্নতা বলে মানতে হবে—পরিমাণগত অভিন্নতা কখনই নয়। আংটি এবং বালার মতো স্বর্ণালঙ্কারে যে সোনা দেখি, তা গুণগত

বিচারে সোনার খনির সোনার গুণগত সমপর্যায়ভুক্ত, তবে সোনার খনির পরিমাণগত সোনার সঙ্গে সেই অলঙ্কারের তুলনা করা চলে না। ঠিক সেইভাবেই, যদিও আমরা গুণগত বিচারে শ্রীভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত, যেহেতু তার অনন্ত শক্তির চিন্ময় অভিপ্রকাশ রূপে আমাদের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁর পরমশক্তির কাছে গুণগতভাবে আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ এবং নিত্য দাসপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবমাত্র। সুতরাং শ্রীভগবানকে বলা হয় *বিভু*, অর্থাৎ পরম শক্তিসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র, আর আমরা *অণু*, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আর অধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট।

এই বিষয়টি বৈদিক সাহিত্যসম্ভারে *নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* (কঠোপনিষদ ২/২/১৩) শ্লোকটিতে পুনরায় প্রতিপাদিত হয়েছে। অগণিত নিত্যস্থিত জীব রয়েছে, যারা পরমেশ্বর ভগবানরূপী পরম সত্ত্বার উপরে নিত্য নির্ভরশীল হয়ে আছে। কিন্তু সেই সকল জীবই পরম সত্ত্বার উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে, কারণ এই নির্ভরশীলতা কোনওক্রমেই জড়জাগতিক অস্তিত্বের সৃষ্টি কোনও মায়ামোহ নয়—যেকথা নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা বলে থাকেন। আসলে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নিত্যকালের সম্পর্ক থাকলেও ঈশ্বর নিত্যশ্রেষ্ঠ এবং আমরা নিত্যদাস। শ্রীভগবান নিত্যস্বরাট, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আর আমরা নিত্য অধীন। শ্রীভগবান স্বয়ং অনন্ত পরমতত্ত্ব, আর আমরা অনন্তকাল তাঁর পরমতত্ত্বের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছি।

যদিও শ্রীভগবান যে কোনও জীব অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে বিপুল বিরাট, অর্থাৎ সমস্ত জীবকুল একত্রিত করলেও তিনি তার চেয়েও বিরাট, তবে প্রত্যেক জীব গুণগতভাবে শ্রীভগবানেরই অভিন্ন সত্ত্বা, কারণ সকল জীব তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁরই অনন্ত সত্ত্বা থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। অতএব, একদিক থেকে বিবেচনা করলে, শ্রীভগবানের একটি নিকৃষ্ট সহযোগী শক্তিরূপে প্রতিভাত মহা জাগতিক অভিপ্রকাশ থেকে জীবসত্ত্বা ভিন্ন হয়। জীব এবং জড়া প্রকৃতি (অর্থাৎ স্ত্রীসত্ত্বা) পরম পুরুষেরই অধীনস্থ অভিপ্রকাশ। পার্থক্য এই যে, জীবসত্ত্বা শ্রীভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি, কারণ জীব শ্রীভগবানের মতোই সচেতন এবং নিত্যধর্মসম্পন্ন, সেক্ষেত্রে জড়া প্রকৃতি শ্রীভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি, কারণ তা অচেতন এবং নিত্যসত্ত্বা বিহীন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরম বস্তু একটাই এবং সেটি পরমাত্মা, কিংবা পরম সত্ত্বা। যখন কেউ পরমাত্মার শুধুমাত্র আংশিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, তখন তাঁর জীবনের উপলব্ধিকে বলা হয় *আত্মদর্শন* বা আত্ম-উপলব্ধি। আর যখন এই আংশিক অন্তর্দৃষ্টিরও অভাব ঘটে, তখন তার

অস্তিত্বকে বলা হয় *অনাত্মদর্শন*, অর্থাৎ আত্ম-অজ্ঞতা। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার পার্থক্য সম্পর্কে কোনও পরিচয় না পেয়ে, পরমাত্মার আংশিক উপলব্ধি নিয়ে জীব তার পারমার্থিক সাফল্যের মাধ্যমে গর্ববোধ করতে পারে, তার ফলে মানসিক জল্পনার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে সর্ব বিষয়েই ভগবানের সমকক্ষ মনে করতে থাকে। অন্যদিকে, অনাত্মদর্শন তথা জাগতিক অজ্ঞতার পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়ে জীব মাত্রেই মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চেয়ে সে একেবারেই ভিন্ন; এবং এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে যেহেতু প্রত্যেকেই আপনার চিন্তাতেই মগ্ন, তাই জীবমাত্রেই শ্রীভগবানকে ভুলে গিয়ে মনে করে যে, শ্রীভগবান তার থেকে একেবারেই ভিন্ন এবং তার সঙ্গে শ্রীভগবানের কোনই বাস্তবিক সম্বন্ধ নেই।

এইভাবে নির্বিশেষবাদী নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা কেবলই শ্রীভগবান এবং জীবের একাত্মতা সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে থাকে, অথচ সাধারণ জড়বাদীরা শ্রীভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, পরমতত্ত্ব একাধারেই ভিন্ন এবং অভিন্ন বটে (*অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব*)। বাস্তবিকই, শ্রীভগবানের থেকে আমরা নিত্যকালই ভিন্ন। কারণ জীব এবং শ্রীভগবান অনন্তকাল যাবৎ ভিন্ন সত্ত্বারূপে প্রতিভাত বলেই, এই দুইয়ের মধ্যে একটা নিত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠাও স্বাভাবিক। আর যেহেতু প্রত্যেক জীব গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমান, তাই সেই সম্পর্ক থেকেই প্রত্যেক জীবের পরম অস্তিত্বের সারতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে (মধ্য ২০/১০৮) তাই বলা হয়েছে, *'জীবের স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্য দাস'*। প্রত্যেক জীবের পরম অপরিহার্য পরিচয় হল এই যে, শ্রীভগবানের সেবকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার সম্বন্ধ রয়েছে।

মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, সে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যদাস, তা হলে সে যথার্থই বুঝতে পারে—জীব এবং জড়জাগতিক ব্রহ্মাণ্ড সবই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই উৎসারিত হয়েছে বলে এই সবই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ এবং সেই কারণেই এই সবকিছুই পরস্পর অভিন্ন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "জড়জাগতিক পৃথিবী একই সাথে ভিন্নতা এবং অভিন্নতার অভিপ্রকাশ, এবং এই বিষয়টি পরমেশ্বর ভগবানেরই একটি রূপ। এইভাবেই অনিত্য অস্থায়ী, বিনাশশীল এবং নিত্য পরিবর্তনশীল এই জড়জাগতিক পৃথিবী নিত্যস্থিত বৈকুণ্ঠধাম থেকে ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন।"

লক্ষ্য করা উচিত যে, এই শ্লোকে *সদসদাত্মকম্*, অর্থাৎ "স্থূল এবং সূক্ষ্ম বস্তু সম্পন্ন", কথাটি জড় বস্তু এবং চিন্ময় বস্তু বোঝায়নি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৎ ও

অসৎ, সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকৃতির বস্তু দিয়ে গঠিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, "আপাতদৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যক্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকে 'অব্যক্ত' বলা হয়ে থাকে, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত জগতের অতীত যে অস্তিত্ব, তাকে 'অপ্রাকৃত অব্যক্ত চিন্ময়' বলা হয়। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত সবকিছুর আবরণের মধ্যে, মহাকালের পরিবেশে, বিভিন্ন জড়জাগতিক অস্তিত্বের নিয়ন্তা শ্রীবিগ্রহ দ্বারা জাগতিক সৎ এবং অসৎ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডে, যাকে তৃতীয় তত্ত্ব বলা হয়, (অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকৃতি থেকেই ভিন্ন) সেইগুলি পরম তত্ত্বের প্রতি কোনও প্রকার মতদ্বৈততা সৃষ্টি করতে পারে না।"

অপরপক্ষে, অনভিজ্ঞ জড় জাগতিক ভাবধারাসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা পরমোৎসাহে এমন কোনও জাগতিক নীতি উদ্ধারের অপচেষ্টা করতে পারে, যার সাহায্যে শ্রীভগবানকে নস্যাৎ করতে কিংবা তাঁর অস্তিত্ব অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন করা যায়, তবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেহেতু শ্রীভগবানেরই বিস্তার এবং তাই এই জগৎ চিন্ময় স্তরে তাঁরই স্বরূপ থেকে অভিন্ন, অতএব পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম কর্তৃত্বের কোনও প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করা চলে না।

বস্তুত, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিদাকাশ সমেত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রমাণ স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। এই উপলব্ধি নিয়ে, নব যোগেন্দ্রগণ চিন্ময় আনন্দসহকারে পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করছিলেন।

শ্লোক ২৩

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-
গন্ধর্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্ ।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-
বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্ ॥ ২৩ ॥

অব্যাহত—অপ্রতিহতভাবে; **ইষ্টগতয়ঃ**—যেমন ইচ্ছা ভ্রমণে; **সুর**—দেবতাদের; **সিদ্ধ**—সাধকগণ; **সাধ্য**—সাধ্যগণ; **গন্ধর্ব**—দিব্য গীতকারগণ; **যক্ষ**—কুবের সঙ্গীগণ; **নর**—মানবজাতি; **কিন্নর**—ইচ্ছানুযায়ী দেহ পরিবর্তনে সক্ষম কনিষ্ঠ দেবতাগণ; **নাগ**—এবং সর্পেরা; **লোকান্**—বিভিন্ন গ্রহলোকগুলি; **মুক্তাঃ**—মুক্তচিত্তে; **চরন্তি**—তাঁরা পর্যটন করেন; **মুনি**—মুনিবর্গের; **চারণ**—দেবদূতগণ; **ভূতনাথ**—দেবাদিদেব শিবের অনুচর ভূতপ্রেতাদি; **বিদ্যাধর**—স্বর্গলোকের গায়কবৃন্দ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণমণ্ডলী; **গবাম্**—এবং গাভীদের; **ভুবনানি**—গ্রহমণ্ডলীর; **কামম্**—যেভাবে কামনা করতেন।

অনুবাদ

নব যোগেন্দ্রগণ মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা অবাধে কোথাও আসক্ত না হয়ে সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, মুনি, চারণ, ভূতাধিপতি, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গাভীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহলোকগুলিতে স্বেচ্ছামতো পরিভ্রমণ করতেন।

শ্লোক ২৪

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া ।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

তে—তাঁরা; একদা—এক সময়ে; নিমেঃ—নিমিরাজার; সত্রম্—সোম যজ্ঞে; উপজগ্মুঃ—তাঁরা সমাগত হয়ে; যদৃচ্ছয়া—তাঁদের অভিলাষক্রমে; বিতায়মানম্—অনুষ্ঠানের সময়ে; ঋষিভিঃ—ঋষিবর্গের দ্বারা; অজনাভে—ভারতবর্ষে; মহাত্মনঃ—মহাত্মার।

অনুবাদ

একদা তাঁরা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে এই ভারতবর্ষে (পূর্বে 'অজনাভ' নামে পরিচিত) যে স্থানে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন।

শ্লোক ২৫

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব এবোপতস্থিরে ॥ ২৫ ॥

তান্—তাঁদের; দৃষ্ট্বা—দেখে; সূর্য—সূর্য; সঙ্কাশান্—তেজস্বিতায়; মহাভাগবতান্—পরম ভগবদ্ভক্ত; নৃপ—হে রাজন্ (বসুদেব); যজমানঃ—যজ্ঞকর্তা নিমিরাজা; অগ্নয়ঃ—অগ্নি যজ্ঞ; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণেরা; সর্বে—সকলে; এব—প্রত্যেকে; উপতস্থিরে—শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন সূর্যের মতো অতি তেজস্বী ঐ সকল মহাভাগবতদের দর্শন করে, যাজক, ব্রাহ্মণেরা, এমন কি যজ্ঞের অগ্নিও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শ্লোক ২৬

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্ ।
প্রীতঃ সংপূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হত ॥ ২৬ ॥

বিদেহঃ—নিমি মহারাজ; **তান্**—তাঁদের; **অভিপ্রেত্য**—চিনতে পেরে; **নারায়ণ-পরায়ণান্**—যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য নারায়ণভক্তি; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট করে; **সংপূজয়াম্ চক্রে**—তিনি সম্যক্‌রূপে তাঁদের পূজা-অর্চনা করলেন; **আসনস্থান্**—তাঁদের আসনে উপবেশন করালেন; **যথা-অর্হতঃ**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

বিদেহরাজ [নিমি] জানতেন যে, ঐ ন'জন ঋষি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্তবৃন্দ। তাই, তাঁদের আগমনে পরম প্রীতিসহকারে তিনি তাঁদের যথাযথভাবে আসন প্রদান করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে মানুষ পূজা করে থাকে, সেইভাবেই যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের পূজা-অর্চনা করলেন।

তাৎপর্য

যথার্হতঃ শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *যথার্হতঃ* মানে *যথোচিতম্*, অর্থাৎ "যথাসম্ভ্রম সহকারে"। এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণ নারায়ণপরায়ণ, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তথা শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্তবৃন্দ। সুতরাং, *যথার্হতঃ* শব্দটি বোঝায় যে, ন'জন ঋষিকে রাজা যথার্থ বৈষ্ণব সদাচরণমতেই অর্চনা করেছিলেন। যথার্থ মহান্ বৈষ্ণবদের পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে সদাচরণ সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন—কোনও বৈষ্ণব যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা-অভিলাষের উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে থাকেন, সেজন্য তাঁকে শ্রীভগবানের ইচ্ছার সাক্ষাৎ প্রতিভূরূপে সম্মান জানানো কর্তব্য। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সাথে ক্ষণকালের জন্যও সঙ্গলাভ করতে পারলে মানুষ জীবনের সকল বিষয়ে সার্থকতা অর্জন করতে পারে। সুতরাং, *প্রীতঃ* শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ঋষিবর্গের শুভ আগমনে নিমিরাজা পরম হর্ষ লাভ করেছিলেন, এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে উপাসনা করা উচিত, ঠিক সেইভাবে তিনি তাঁদের উপাসনা করেছিলেন।

যদিও নিরাকারবাদী দার্শনিকেরা দাবী করে থাকে যে, প্রত্যেক জীবমাত্রেই ভগবানের সমকক্ষ, তবুও তারা নির্বোধের মতো এই বিষয়টিতে তাঁদের তথাকথিত গুরুবর্গের পরামর্শ উল্লঙ্ঘন করে থাকে এবং এই সমস্ত গুরুদেব নিরাকারবাদ-সম্পর্কিত কাল্পনিক ধারণাগুলির অবমাননা করে তারা নিজেদেরই মনগড়া অভিমত জানিয়ে অবাধে পরমতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে যথেচ্ছ মন্তব্য করে থাকে।

পক্ষান্তরে, মায়াবাদী নিরাকার তত্ত্ববিদেরা যদিও প্রতিপন্ন করতে চায় যে, প্রত্যেকেই ভগবান, শেষ পর্যন্ত তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যরূপ এবং

লীলাবৈচিত্র্যের বাস্তবতা অস্বীকার করার মাধ্যমে ভগবানের উদ্দেশ্যে একপ্রকার অসম্মানজনক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েই থাকে। এইভাবে শ্রীভগবানের রাজ্যে সকল জীবের নিত্যকালের সত্তা এবং লীলাপ্রসঙ্গ অস্বীকার করার মাধ্যমে, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই সমস্ত জীবের নিত্যকালের মর্যাদা হানি করে থাকে। নিরাকারবাদীরা তাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ জীবকুলকে তত্ত্বগতভাবে এক নিরাকার, নাম পরিচিতিবিহীন জ্যোতিমাত্ররূপে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবেচনা করে, তাদেরই কষ্টকল্পনা দিয়ে পরমতত্ত্বরূপী ভগবান রূপে বোঝাতে চায়। বৈষ্ণবজনেরা অবশ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানকেই আহ্বান করে থাকেন এবং অনায়াসেই বুঝতে পারেন যে, জড় জাগতিক পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত বদ্ধ, সীমায়িত, জড়চেতনাবিশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তিবিশেষের দেখা পাই, অসীম শক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পক্ষে তাদের সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়া করবার প্রয়োজনই হয় না। নিরাকারবাদীরা উদ্ধতভাবে ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য কোনও অপ্রাকৃত চিন্ময় অনন্ত পুরুষসত্তা থাকতেই পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবজনেরা তাঁদের প্রকৃত উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ফলে উপলব্ধি করেন যে, আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতারও বাইরে অনেক দূরে বহু বিস্ময়কর বস্তু অবশ্যই থাকতে পারে এবং রয়েছেও। সুতরাং তাঁরা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৯) শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্বীকার করে থাকেন—

যো মামেবসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

"হে ভারত (অর্জুন), যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "পরমতত্ত্ব এবং জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকটিতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ। যে অনভিজ্ঞ, সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তাঁর অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এমন নয় যে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে *ভগবদ্গীতা* থেকে শ্রবণ করতে হবে যে, জীব সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবানের অধীনতত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব

উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই *বেদের* যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন, তা ছাড়া অন্য কেউই *বেদের* উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নন।"

সুতরাং, এখানে *নারায়ণ-পরায়ণান্* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণের মতো মহান ভক্তবৃন্দ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বদাই স্বীকার করতেন।

নিমিরাজ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাই *যথার্হতঃ* শব্দটির মাধ্যমে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেইভাবেই তিনি মহর্ষিদের উপাসনা করেছিলেন, ঠিক যেমনভাবে তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপাসনা করে থাকেন। যদিও নিরাকারবাদীরা অযথা প্রতিপন্ন করতে চায় যে, প্রত্যেক জীবই ভগবানের সমকক্ষ, কিন্তু তারা কোনও জীবকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা করতেই পারে না, তার কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মে তারা প্রথমেই একটি অপরাধ করে থাকে। তারা যাকে পূজা উপাসনা করে থাকে, এমন কি তাদের নিজেদের গুরুবর্গের উপাসনা যেভাবে করে, তা পরিণামে আত্মসেবামূলক এবং সুবিধাবাদী প্রয়াস বলেই দেখা যায়। যখন কোনও নিরাকারবাদী কল্পনা করে যে, সে ভগবান হয়ে গেছে, তখন আর তার গুরু বলতে অন্য কারও দরকার মনে করে না।

অবশ্য, সে কোনও বৈষ্ণব শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন বলে তিনি সকল জীবকে, বিশেষত যারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছে, সেই সকল অতি ভাগ্যবান জীব সমাজকে অনন্ত শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করতে অভিলাষী হন। শ্রীভগবানের কোনও প্রতিভূর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবের উপাসনা কখনই আত্মরতিমূলক কিংবা সুবিধাবাদীর মনোভাবাপন্ন হয় না, বরং এই শ্লোকে *প্রীতঃ* শব্দটির মাধ্যমে যে ভাবধারার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেইভাবেই শ্রীভগবান এবং তাঁর প্রতিভূগণের উদ্দেশ্যে নিত্যকালের প্রেমভক্তির অভিপ্রকাশরূপে বৈষ্ণবজনের সেই উপাসনা তথা শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়ে থাকে।

সুতরাং এই শ্লোকটি থেকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কেবলমাত্র ঋষভদেবের ন'জন মহিমান্বিত পুত্রেরাই নয়, নিমিরাজাও স্বয়ং নিরাকারবাদের কৃত্রিম তথা অসম্পূর্ণ ভাবধারা বর্জন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্নব ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

তান্—তাঁদের; রোচমানান্—শোভমান; স্ব-রুচা—তাঁদের আপন শোভায়; ব্রহ্ম-পুত্র-উপমান্—ব্রহ্মার পুত্রদেরই মতো; নব—নয়জন; পপ্রচ্ছ—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; পরম-প্রীতঃ—অপ্রাকৃত বিনয় সহকারে; প্রশ্রয়—প্রণত হয়ে; অবনতঃ—দণ্ডবৎ জানিয়ে; নৃপঃ—রাজা।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নতশিরে বিনয়াবনত হয়ে ঐ ন'জন মুনিকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী হলেন। এই ন'জন মহাত্মা তাঁদের দেহকান্তি নিয়ে শোভায়মান হয়েছিলেন এবং সনককুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রদেরই মতো প্রতিভাত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *স্বরুচা* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, নবযোগেন্দ্র মুনিগণ তাঁদের অলঙ্কার-ভূষণাদি কিংবা অন্য কোনও কারণে নয়, তাঁদের আপন দিব্য জ্যোতির ফলেই উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আলোকের মূল উৎস। তাঁর অতীব উদ্ভাসিত দেহকান্তি সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতি তথা অপরিমেয় দিব্য চিন্ময় আলোকরাশির উৎস, যার মাঝে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডরাজি নির্ভর করে রয়েছে (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*)। শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ বিভিন্ন জীবাত্মাও আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বাস্তবিকপক্ষে, শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রত্যেকটি বস্তুই আপন জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছে, তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৬) বলা হয়েছে—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

ইতিপূর্বেই নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণ শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্ত ছিলেন। সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধাত্মারূপে তাঁরা স্বভাবতই বিপুল জ্যোতি প্রকাশ করছিলেন, এখানে তা *স্বরুচা* শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ব্রহ্মপুত্রোপমান্* শব্দটির অর্থ 'ব্রহ্মার পুত্রদের সমান', যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণ চারজন মহিমান্বিত সনকাদি কুমার ভ্রাতাদের মতোই দিব্যস্তরে অবস্থান করছিলেন। চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজা পৃথু বিপুল প্রেমভক্তি সহকারে চার কুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, এবং এখানে নিমিরাজও সেইভাবে ঋষভদেবের নয়জন পুত্রকে অভ্যর্থনা করেন। সুখসমৃদ্ধি লাভে আগ্রহী সকলের পক্ষেই মহান বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা সর্বজনবিদিত পারমার্থিক সদাচরণ।

শ্লোক ২৮

শ্রীবিদেহ উবাচ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিদেহঃ উবাচ—বিদেহরাজ বললেন; **মন্যে**—আমি মনে করি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ; **পার্ষদান্**—আপন সহযোগীগণ; **বঃ**—আপনি; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু দানবের শত্রু; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ভূতানি**—সেবকবৃন্দ; **লোকানাম্**—সকল বিশ্বের; **পাবনায়**—শুদ্ধিকরণের জন্য; **চরন্তি**—তাঁরা বিচরণ করেন; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

বিদেহরাজ নিমি বললেন—মধু-দানবের নিধনকারী প্রখ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদরূপে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের চিনতে পেরেছি। অবশ্যই, শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধ ভক্তগণ এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপন স্বার্থবিনা অন্য সকল বদ্ধ জীবকুলের বিশুদ্ধি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পর্যটন করে থাকেন।

তাৎপর্য

এখানে রাজা নিমি মহর্ষিদের দিব্য কার্যক্রমের গরিমা বর্ণনা করে তাঁদের অভ্যর্থনা করছেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যপ্রভাবের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন, তা সর্বজনবিদিত, সেকথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্*। ঠিক তেমনই, তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণও অপ্রাকৃত দিব্য স্তরে বিরাজ করে থাকেন। প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ স্বরূপ ঐ ধরনের দিব্য জীবগণকে কেমন করে জড় জগতের মধ্যে দেখা যেতে পারে। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে, *পাবনায় চরন্তি হি*—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ বৈষ্ণবেরা অধঃপতিত বদ্ধ জীবগণকে উদ্ধারের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করে থাকেন। দেশের রাজপ্রতিনিধিকে কারাগারের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যেতে পারে, তবে তাতে এমন বোঝায় না যে, ঐ রাজপ্রতিনিধি বদ্ধ কারাবাসী হয়ে গিয়েছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, কারাবন্দীদের মধ্যে যারা তাদের পাপাচরণের প্রবৃত্তি সংশোধন করেছে, তিনি কারামধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্যোগী রয়েছেন। সেইভাবেই, পরিব্রাজকাচার্যরূপে খ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তবৃন্দ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরিভ্রমণের সময়ে প্রত্যেককে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজনিকেতনে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আহ্বান জানিয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলের মুক্তি প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদবর্গের কৃপার বিবরণ রয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বিষ্ণু পার্ষদবর্গ তথা বৈষ্ণবেরা স্বয়ং শ্রীভগবানের মতোই কৃপাময় হয়ে থাকেন। যদিও মানবসমাজের অজ্ঞজনেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দাস তথা বৈষ্ণবদের সান্নিধ্য লাভ করতে উৎসাহ বোধ করে না, তাই ভগবদ্ভক্তগণ বৃথা অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে না থেকে, বদ্ধ জীবকুলকে তাদের চিরকালের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য নিজেরাই সক্রিয় হন।

শ্লোক ২৯

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

দুর্লভঃ—দুষ্প্রাপ্য; **মানুষঃ**—মানুষের; **দেহঃ**—শরীর; **দেহিনাম্**—শরীরধারী জীবগণ; **ক্ষণভঙ্গুরঃ**—যে কোনও মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে; **তত্র**—সেই মানব শরীরে; **অপি**—এমন কি; **দুর্লভম্**—দুষ্প্রাপ্য; **মন্যে**—মনে করি; **বৈকুণ্ঠ-প্রিয়**—যারা পরমেশ্বর ভগবান বৈকুণ্ঠের পরম প্রিয়জন; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎ লাভ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবগণের পক্ষে মানব দেহ লাভ করা অতীব কঠিন, এবং তা যে কোনও মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে, মানব জীবন লাভ করেছে যারা, তাদের পক্ষে ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রিয়ভাজন শুদ্ধ বৈষ্ণবভক্তগণের সাহচর্যও অতিশয় দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, *দেহিনাং* শব্দটির অর্থ *বহবো দেহা ভবন্তি যেষাং তে,*—"বদ্ধ জীবকুল, যারা অসংখ্য জড়জাগতিক শরীর ধারণ করে।" কিছু চিন্তাবিলাসীদের মতে, মানবরূপী জীবনে এসে জীবসত্ত্বা আর কখনই কোনও পশু কিংবা বৃক্ষলতার মতো ইতর রূপের পর্যায়ে অধঃপতিত হবে না। তবে, এই ধরনের কল্পনা বিলাসিতা সত্ত্বেও, একথা সত্য বলে মানতেই হবে যে, বর্তমানে আমাদের কার্যকলাপের পরিণাম অনুযায়ী আমরা ভগবানের বিধিনিয়মে উন্নত কিংবা অধঃপতিত হবই। বর্তমান যুগে মানব সমাজে জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনই পরিচ্ছন্ন বা সঠিক ধারণা কারও নেই। নির্বোধ বিজ্ঞানীরা সরলমতি মানুষদের ধাপ্পা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতি উচ্চমানের আধুনিক ধরনের বাক্যবিন্যাস উদ্ভব করেছে যা দিয়ে সকলকে বিশ্বাস করানো যায় যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রাণের

সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর রচিত *জীবন আসে জীবন থেকে* গ্রন্থখানির মধ্যে এই ধাপ্পা উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, যাতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিজ্ঞানীরা যদিও দাবি করে থাকে যে, রাসায়নিক পদার্থগুলি থেকেই প্রাণ সৃষ্টি হয়, তারা তবুও একটা রসায়নাগারে অসংখ্য প্রকার রসায়ন পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একটি পোকাও তা থেকে নিজেরা উৎপন্ন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, জীবন এবং চেতনা সবই চিন্ময় আত্মার লক্ষণাবলী—কোনও রসায়নে কিংবা রাসায়নিক মিশ্রণের মাধ্যমে যা আজও পাওয়া যায়নি।

জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থখানির ৪৩ পৃষ্ঠায় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "সকল জীবসত্ত্বা এক রূপ দেহ থেকে অন্য এক দেহরূপে চলে যায়। রূপগুলি ইতিপূর্বেই বিদ্যমান রয়েছে। জীব শুধুমাত্র নিজেকে স্থানান্তরিত করে, ঠিক যেভাবে মানুষ একটি আবাস থেকে অন্যত্র স্থান বদল করে থাকে। একটা বাসস্থান প্রথম শ্রেণীর, অন্যটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, আবার আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর হয়। ধরা যাক, একটি লোক নিম্ন শ্রেণীর আবাসন থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর আবাসনে এল। লোকটি একই জন। কিন্তু এখন, তার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য মতো, অর্থাৎ কর্ম অনুসারে, সে একটা উঁচু দরের আবাসনের দখল নিতে পারে। যথার্থ বিবর্তন বলতে শারীরিক বিকাশ বা পরিবর্তন বোঝায় না, তবে সেটা হল চেতনার বিকাশ।" প্রত্যেক রকমের জীবযোনির মধ্যেই চেতনা থাকে, আর সেই চেতনা জীবসত্ত্বার লক্ষণ, যে-জীবসত্ত্বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি। এই ধরনের ৮৪,০০,০০০ প্রকার প্রজাতির জীবযোনি তথা প্রাণসত্ত্বার মাধ্যমে চেতনা-সঞ্জীবিত জীবসত্ত্বার দেহান্তরের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারলে, কেউ সম্ভবত *দুর্লভো মানুষ্যদেহঃ* "মনুষ্যদেহ লাভ করা দুর্লভ বিষয়" কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে পারবে না।

এই অপরিহার্য বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্রে এখন মানুষকে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। মনুষ্য প্রজাতিরও নিম্নবর্গে যে আশী লক্ষাধিক প্রজাতি রয়েছে, সেইগুলির মাঝে বিচ্যুতির বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অনবহিত। কোনও মানবসত্ত্বা প্রগতির ভাবধারায় চিন্তা করে, সেটা স্বাভাবিক। আমরা বুঝতে চাই যে, আমাদের জীবনের প্রগতি হচ্ছে এবং আমাদের জীবনের গুণবৈশিষ্ট্য বিকাশের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে চলেছি। অতএব, অতি মূল্যবান মানব জীবন অপব্যবহারের মহাবিপদ সম্পর্কে জনমানবকে অবহিত করা আশু প্রয়োজন এবং মানবজীবনে যেভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুযোগ এনে দেয়, সেই সম্পর্কে সকলকে জানানো দরকার।

ঠিক যেভাবে পৃথিবীতে উচ্চশ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন আবাসন অঞ্চলগুলি বিভক্ত করা আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝেও তেমনই উচ্চশ্রেণী,

মধ্যম শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর গ্রহমণ্ডলী রয়েছে। যোগপদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে, কিংবা নিষ্ঠাভরে ধর্মকর্ম অনুশীলনের ফলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উচ্চকোটির গ্রহমণ্ডলীতে মানুষ নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। তা না হলে, ধর্মকর্ম অনুশীলনে অবহেলার ফলে, মানুষ নিম্নতর গ্রহে নিজের অবনতি লাভ করতে পারে।

তবে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ব্যক্ত করেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।* তাই চরম সিদ্ধান্ত হল এই যে, জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রহলোকই বসবাসের অযোগ্য এবং অনুপযুক্ত, কারণ প্রত্যেকটি গ্রহের মধ্যেই জরাবার্ধক্য ও মৃত্যুস্বরূপ অনাদি ত্রুটিগুলি রয়েছে। শ্রীভগবান অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, জড় জাগতিক মহাব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরে অবস্থিত তাঁর যে দিব্য ধাম রয়েছে, সেখানে জীবন ধারা চিরন্তন, আনন্দময় এবং সম্পূর্ণভাবে সৎ জ্ঞান সমৃদ্ধ। জড় জগৎ অস্থায়ী, দুর্যোগময় এবং অজ্ঞতায় কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু বৈকুণ্ঠ নামে চিন্ময় জগতটি নিত্যস্থায়ী, পরমানন্দময় এবং যথার্থ জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ।

চরম উৎকর্ষলব্ধ মানব-মস্তিষ্ক শ্রীভগবানের দান, যার ফলে আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে যা নিত্যস্থায়ী এবং যা অনিত্য, অস্থায়ী, তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (২/১৬) বলা হয়েছে—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

"যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা, তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই, এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তত্ত্বদ্রষ্টাগণ উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।"

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্যধামকে জীবনের চরম লক্ষ্যস্বরূপ স্বীকার করেছেন, তাঁদের বৈকুণ্ঠপ্রিয় বলা হয়ে থাকে। এখানে মহারাজ নিমি বলেছেন যে, সেই ধরনের জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত পরমার্থবাদী মানুষদের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করা অবশ্যই মানব জীবনের সদর্থকসিদ্ধি লাভ বলে গণ্য করা চলে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি যেন আমরা অনুধাবন করি—

নৃদেহম্ আদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্
ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"[পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন—] শ্রেষ্ঠতম শরীর এই সুদুর্লভ মানব দেহ এক পরম প্রাপ্তি, এবং তা একটি তরণীর সাথে তুলনীয়। শ্রীগুরুদেব এই তরণীর সুযোগ্য কর্ণধার, এবং তা পরিচালনার জন্য আমি অনুকূল পবন (বেদ গ্রন্থাবলী) সৃষ্টি করে দিয়েছি। এইভাবে ভবসাগর অতিক্রমের সকল প্রকার সুব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি। যে মানুষ মানব-জীবনের এই সমস্ত অপূর্ব সুন্দর সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, তবু ভবসাগর পার হতে পারেনি, তাকে আত্মহন্তা বলেই মনে করতে হবে।" (*ভাগবত* ১১/২০/১৭)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যসেবকগণ জড়জাগতিক কর্মবন্ধনের ফলে আবদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য কৃপাবশে বৈষ্ণবরূপে জড় জগতে অবতীর্ণ হন। নিরাকারবাদী পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান যারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছে, ঐ সব বৈষ্ণবগণ তাদেরও কৃপা বিতরণ করে থাকেন। শ্রীনারদ মুনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দিব্যোন্মাদনাময় ভগবৎ-প্রেম ছাড়া পরমতত্ত্বের ঐ ধরনের প্রাণান্তকর, নিরাকার কল্পচিন্তা অবশ্যই দুর্ভোগময় (*নৈষ্কর্ম্যমপি অচ্যুতভাব বর্জিতম্*), এবং তার সঙ্গে সাধারণ স্থূল জড়জাগতিক জীবনের অগণিত সমস্যাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও চলে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অধিকাংশ মানুষই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির স্বর্গসুখের স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে অর্থসম্পদ লাভের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে। অন্য অনেকে সাধারণ জড়জাগতিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের আত্মসত্ত্বা নস্যাৎ করবার চেষ্টা করছে এবং যোগ আর ধ্যান চর্চা বলতে যা বুঝেছে, তারই মধ্যে দিয়ে ভগবৎ-সত্ত্বার মাঝে বিলীন হতে চাইছে। উভয় শ্রেণীর অসুখী মানুষগুলি তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বপ্নবিলাসের সঙ্গে তাদের বিরক্তিকর নিরাকারবাদী স্বকপোল কল্পনা সবই সরিয়ে রেখে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কৃপা গ্রহণ করছে। তাঁরা শ্রীভগবানের নাম কীর্তন, উদ্দণ্ড নৃত্যগীত, এবং ভগবানের পবিত্র প্রসাদ আস্বাদনের মাধ্যমে ভগবানের দিব্যনাম জপকীর্তন করতে শিখছে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবান স্বয়ং যে সব অপ্রাকৃত জ্ঞানগর্ভ অভিব্যক্ত করেছেন, সেইগুলি আস্বাদনের মাধ্যমে উৎফুল্ল হচ্ছেন। *ভগবদ্গীতার* (৯/২) শ্লোকের মধ্যে শ্রীভগবান বলেছেন—"*সুসুখম্ কর্তুম্ অব্যয়ম্*"। চিন্ময় পারমার্থিক স্বাধীনতা অর্জনের যথার্থ প্রক্রিয়া খুব আনন্দময় এবং তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অথবা নিরাকারবাদী শুষ্ক বাক্চাতুর্যের কোনই সম্বন্ধ থাকে না। ক্রমশ বহু মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করছেন, ক্রমশ তা অন্য বহুজনের মধ্যে প্রসারের চেষ্টা করছে। এইভাবেই সমগ্র জগৎ প্রাণময় হয়ে উঠবে এবং বৈষ্ণবদের কৃপা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

শ্লোক ৩০

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

অতঃ—অতএব; **আত্যন্তিকম্**—পরম; **ক্ষেমম্**—মঙ্গল; **পৃচ্ছামঃ**—আমি প্রশ্ন করছি; **ভবতঃ**—আপনাদের; **অনঘাঃ**—নিষ্পাপ পুরুষগণ; **সংসারে**—জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে; **অস্মিন্**—এই; **ক্ষণ-অর্দ্ধঃ**—অর্ধেক মুহূর্ত মাত্র; **অপি**—যদিও; **সৎসঙ্গঃ**—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ; **শেবধিঃ**—মহানিধি; **নৃণাম্**—মানুষের পক্ষে।

অনুবাদ

অতএব, হে পূর্ণ নিষ্পাপ মহাপুরুষগণ, আমি প্রশ্ন করছি—কৃপা করে পরম মঙ্গল বিষয়ে আমাকে কিছু বলুন। বাস্তবিকই, জন্ম এবং মৃত্যুর এই জগতের মাঝে ক্ষণার্ধকালের জন্যও কোন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গ লাভ করা গেলে, যে কোনও মানুষের জীবনেই তা পরমনিধি লাভ স্বরূপ আনন্দজনক হয়।

তাৎপর্য

শেবধিঃ অর্থাৎ 'মহানিধি' তথা মহাসম্পদ শব্দটি এই শ্লোকে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন কোনও সাধারণ মানুষ একটা অপ্রত্যাশিত সম্পদ আবিষ্কার করে মহা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তেমনই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করেও উৎফুল্ল বোধ করে, কারণ তেমন সঙ্গ থেকে মানুষের জীবন সহজেই সার্থক হয়ে উঠতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে *আত্যন্তিকং ক্ষেমং*, অর্থাৎ 'পরম মঙ্গল' শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এমন পরিবেশ লাভ হয়, যেখানে সামান্যতম ভীতিও স্পর্শ করতে পারে না। এখন আমরা জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুময় সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। যেহেতু এক মুহূর্তেই আমাদের সমগ্র পরিবেশ তথা অবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে, তাই আমরা নিত্যনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছি। তবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত আমাদের শেখাতে পারেন বাস্তবপদ্ধতি যার মাধ্যমে জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করে সকল প্রকার ভয় দূর করতে পারি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত এই যে—স্বাভাবিক লৌকিক ভব্যতা অনুসারে কোনও অতিথির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে তাঁর কুশল প্রশ্ন করতে হয়। তবে যে সকল আত্মতৃপ্ত ভগবদ্ভক্ত নিজেরাই সকল প্রকার কুশল বিতরণ করছেন, তাঁদের প্রতি এই ধরনের কুশল প্রশ্ন অযৌক্তিক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, রাজা জানতেন যে, ঋষিবর্গকে তাঁদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা অযৌক্তিক হবে, যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের

একমাত্র কাজ। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করাই জীবনের লক্ষ্য এবং দিব্য আনন্দময় স্তরে নিত্য ভগবৎ-সেবকরূপে নিজেকে পুনরধিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করাই উচিত। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ সাধারণ জড় জাগতিক ব্যাপারে তাঁদের সময় নষ্ট করেন না। কখনও-বা বৈষ্ণব প্রচারকার্যে নিয়োজিত কোনও ভক্তের মূর্খ আত্মীয়স্বজনেরা আক্ষেপ করতে থাকেন যে, অমন একজন ধর্ম প্রচারক জাগতিক কাজকর্মে তার জীবনের কিছুই দিল না, তাই আধ্যাত্মিক জীবনচর্চা করেই তার অত টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল।

ঐ ধরনের মূর্খ লোকেরা জানে না এবং ধারণাই করতে পারে না যে, ভগবানের বাণী প্রচারে যাঁরা প্রাণমন সমর্পণ করেছেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনধারার স্তরে কী বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। নিমিরাজা নিজেই বিদগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি নির্বোধের মতো সামান্য জড় জাগতিক ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেননি। সরাসরি তিনি *আত্যন্তিকং ক্ষেমম্* জীবনের পরম মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, *অনঘাঃ* অর্থাৎ "হে নিষ্পাপ পুরুষগণ" এই শব্দটির দুটি অর্থ আছে। *অনঘাঃ* বলতে বোঝায় যে, নবযোগেন্দ্রগণ নিজেরাই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন। শব্দটি আরও বোঝায় যে, কেবলমাত্র তাঁদের দর্শনলাভের মহাভাগ্যের ফলে এবং বিনম্রচিত্তে তাঁদের কথা শোনার মাধ্যমে, যে কোনও সাধারণ পাপময় মানুষও তার পাপের ভার লাঘব করতে পারে এবং তার যা কিছু বাসনা, তা পূরণ করতেও পারে।

কেউ আপত্তি করতে পারে যে, মহামুনিরা যেহেতু সবেমাত্র এসেছিলেন, সুতরাং তাঁদের জীবনের সিদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে রাজার এত অধীর হওয়ার দরকার ছিল না। মুনিবর্গ নিজেরাই প্রশ্ন আহ্বান না করা পর্যন্ত হয়ত রাজার প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। এই ধরনের সম্ভাব্য আপত্তি অনুযোগের উত্তরে *ক্ষণার্ধোঽপি* শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের সাথে এক মুহূর্তের কিংবা অর্ধমুহূর্তের জন্য সঙ্গ লাভ হলেই মানুষ ইহ জীবনের সার্থকতা অর্জন করে থাকে। কোনও সাধারণ মানুষকে বিপুল সম্পদ দিলে, সে তৎক্ষণাৎ সেই সম্পদ আঁকড়ে ধরতে চাইবে। সেইভাবেই, নিমিরাজা ভাবছিলেন, "এমন মহান ঋষিদের এখানে অনেকক্ষণ রেখে দিয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব কেন? আমি যেহেতু সাধারণ মানুষ, তাই আপনারা নিশ্চয়ই এখনি চলে যাবেন। তাই কৃপা করে এখনই আপনাদের দিব্য সঙ্গ লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে দিন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই জগতে বিভিন্ন ধরনের কৃপা রয়েছে। কিন্তু সাধারণ কৃপায় সমস্ত দুঃখ মোচন হয় না। অর্থাৎ, বহু মানবহিতৈষী,

জনকল্যাণকামী এবং সমাজসংস্কারক রয়েছেন, যাঁরা নিশ্চয়ই মানবজাতির উন্নতি বিকাশের জন্য কাজ করে থাকেন। তেমন মানুষদের সকলেই কৃপাপরায়ণ বলেই মনে করে থাকে। তবে তাঁদের কৃপা থাকা সত্ত্বেও, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কবলে মানব সমাজ দুঃখকষ্ট ভোগ করেই চলেছে। দুঃস্থজনকে আমি অকাতরে খাদ্য বিতরণ করতে পারি, কিন্তু আমার কৃপায় খাদ্য গ্রহণ করবার পরেও সেই গ্রহীতা আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়বে, অর্থাৎ একইভাবে সে ক্ষুধার জ্বালা থেকে কষ্ট পেতেই থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শুধুমাত্র মানবিকতা কিংবা জনকল্যাণের মাধ্যমে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুঃখদুর্দশা থেকে অব্যাহতি পায় না। তাদের দুর্দশা শুধুমাত্র স্থিমিত হয় কিংবা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়। নবযোগেন্দ্রগণকে দর্শন করে নিমিরাজা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, তার কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যপার্ষদ। তাই তিনি মনে করেছিলেন, "আমার মতো হতভাগ্য সাধারণ জড়ভোগী মানুষদের মতো আপনারা পাপকর্মাদিতে আসক্ত নন। তাই আপনারা যে সব কথা বলেন, তার মধ্যে কোনও ছলনা কিংবা কার্যসিদ্ধির মনোবৃত্তি নেই।"

নানাধরনের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক আলোচনাতেই জড়জাগতিক বদ্ধধারণার জীবগণ তাদের দিনরাত অতিবাহিত করে থাকে। পারমার্থিক জ্ঞানতত্ত্ববিষয়ক কথা শোনবার সময় তারা কখনই পায় না। তবে ক্ষণকালের জন্যও কিংবা ঘটনাক্রমেও যদি তারা কৃষ্ণবিষয়ক হরিকথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গলাভের মাধ্যমে শ্রবণ করে, তা হলে জড়জাগতিক কঠিন বাস্তব দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগের প্রবণতা তাদের জীবনে অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। যখন মানুষ মুক্তপুরুষদের দর্শন লাভ করে, তাঁদের মুখ থেকে কৃষ্ণকথা শোনে, তাঁদের সদাচরণ বিষয়ক নানাকথা স্মরণ করে এবং এইভাবে অনুশীলন করতে থাকে, তখন ইন্দ্রিয় ভোগসুখের মায়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩১

ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্ ।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥ ৩১ ॥

ধর্মান্ ভাগবতান্—ভগবদ্ভক্তিসেবার বিজ্ঞান; **ব্রূত**—কৃপা করে বলুন; **যদি**—যদি; **নঃ**—আমাদের; **শ্রুতয়ে**—যথাযথভাবে শ্রবণের জন্য; **ক্ষমম্**—যথার্থ যোগ্যতা রয়েছে; **যৈঃ**—যে ভক্তিসেবার মাধ্যমে; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রপন্নায়**—শরণাগত;

দাস্যতি—তিনি প্রদান করেন; আত্মানম্—স্বয়ং; অপি—ও; অজঃ—জন্মরহিত ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এই সকল বিষয় যথাযথভাবে শ্রবণের জন্য যদি আমাকে আপনারা যোগ্য বিবেচনা করেন, তা হলে কৃপা করে আমাকে বলুন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবাকর্মে কিভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে যখন কোনও জীব উদ্যোগী হয়, তখন অচিরেই শ্রীভগবান প্রীতিলাভ করেন, এবং তার বিনিময়ে শরণাগত জীবকে নিজ স্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন।

তাৎপর্য

জড় জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে দু'ধরনের অন্তঃসারশূন্য দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মানুষ আছে, যারা পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত জাহির করে থাকে। ব্রহ্মবাদী বলে অভিহিত ঐ ধরনের কয়েকজন প্রতিপন্ন করতে চায় যে, শ্রীভগবানের থেকে আমরা বহু বহু গুণে ভিন্নধর্মী, এবং তাই শ্রীভগবানকে নিয়ে তারা এমনভাবে মনোনিবেশ করতে চায় যেন তিনি এমন কিছু, যা আমাদের জানা-বোঝার অনেক অনেক দূরের বস্তু। ঐ ধরনের চরম দ্বৈতবাদী দার্শনিক মনোভাবাপন্ন লোকগুলি প্রকাশ্যে অথবা সাংগঠনিক উপায়ে ভগবৎ-বিশ্বাসী পুণ্যবান এবং ধার্মিক বলে নিজেদের জাহির করে থাকে, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে যা হয়েছে, তা থেকে ভগবানকে এমনই ভিন্ন রূপে তারা চিন্তা করে থাকে, যাতে তাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের পুরুষসত্ত্বা কিংবা গুণবৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেও কোনই লাভ হয় না। ঐ ধরনের আপাতদৃষ্ট নিষ্ঠাবান লোকগুলি সচরাচর সমাজ, মৈত্রী এবং প্রেমের শিরোনামা নিয়ে জড় জাগতিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা সম্পর্ক সম্বন্ধের মাঝে মেতে উঠে, ফলাকাঙ্ক্ষী কার্যকলাপ তথা স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমূলক উদ্যোগে লিপ্ত হয়।

অদ্বৈতবাদীরা, অর্থাৎ শ্রীভগবানের দ্বৈত সত্ত্বা বিষয়ক ধারণার বিরোধী দার্শনিকেরা দাবি করে থাকেন যে, শ্রীভগবান এবং জীবসত্ত্বার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এবং মায়ার প্রভাবে উদ্ভূত আমাদের ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ করাই, আর নাম, রূপ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিসত্ত্বাবিহীন নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মজ্যোতির মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়াই জীবনের মহান লক্ষ্য। এইভাবেই কষ্টকল্পনাপ্রবণ দার্শনিকদের কোনও পক্ষই অপ্রাকৃত চিন্ময় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কোনও ধারণা করতে সক্ষম হয়নি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, তথা ভগবানের এক সত্ত্বা এবং বিভিন্নতার বিষয়ে পরিষ্কারভাবে তাঁর মহান্ শিক্ষাসূত্র উপস্থাপন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা গুণগত বিচারে শ্রীভগবানের সাথে অভিন্ন, কিন্তু পরিমাণ বিচারে ভিন্ন সত্ত্বা বিশিষ্ট। শ্রীভগবান সবিশেষ ব্যক্তিস্বরূপ দিব্যচেতনা, এবং পরিণামে, আমরাও যখন মুক্তি লাভ করি, তখন আমাদেরও দিব্য রূপ লাভ হয়। পার্থক্য হল এই যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যকালের স্বরূপ এবং পরম পুরুষসত্ত্বা অনন্ত শক্তি ও রূপ মাধুর্যময়, অথচ আমাদের শক্তি আর রূপ ঐশ্বর্য নগণ্য লেশমাত্র। আমাদের আপন শরীর সম্পর্কে খুব সচেতন, সেক্ষেত্রে পরম তত্ত্বের প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের শরীর সম্পর্কে সচেতন, তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।* তবে শ্রীভগবান যদিও জীবসত্ত্বার চেয়ে অনন্তরূপে প্রকাণ্ড, তবু শ্রীভগবান এবং সকল জীবই আকৃতি, সুকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার ভাব-অনুভাবে সমৃদ্ধ।

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অগণিত জীবসত্ত্বা রূপে আপনাকে বিস্তারিত করে তাদের সাথে বিভিন্ন রসাশ্রিত সম্পর্ক উপভোগ করতে অভিলাষ করে থাকেন। জীবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, এবং তারা প্রেমের বন্ধনে তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।

যদিও পরমেশ্বর ভগবান নিত্যকাল যাবৎ সর্বময় কর্তা এবং জীবসত্ত্বা নিত্যকাল সর্ববিষয়েই অধীন, তবু যখন জীব ঐকান্তিক প্রেমভাবাপন্ন হয়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিত্যকাল যাবৎ আত্মনিবেদন করে থেকেও সেই সেবার বিনিময়ে আপনার স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে সামান্যতম আশাও করে না, তখন শ্রীভগবান অচিরেই প্রসন্ন হন, সেই ভাবটি এখানে *প্রসন্ন* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই অনন্তকৃপাময় এবং উদারচিত্ত যে, তেমন কোনও আত্মনিবেদিত এবং প্রেমাকুল সেবকের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তিস্বরূপ, অচিরেই তাঁর সেই আত্মনিবেদিত ভক্তের প্রীত্যর্থে যা কিছু সম্ভব, এমন কি নিজেকেও, তিনি সমর্পণ করতে অভিলাষী হয়ে থাকেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এই প্রেমময় অভিলাষের অগণিত বাস্তব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যশোদা মাতার প্রেমাকর্ষণে শিশুকৃষ্ণ তাঁর দামোদর বন্ধন রূপ নিয়ে, স্বয়ং তাঁর স্নেহময়ী জননীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং শৈশবের শক্তি স্বরূপ তিনি নিজেকে রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হতে দিয়েছিলেন। সেইভাবেই, তার প্রতি পাণ্ডবদের প্রগাঢ় স্নেহ-ভালবাসা-প্রেমের অনুরাগে নিজেকে ঋণী অনুভব করার ফলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি রূপের ভূমিকায় সানন্দে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে

অর্জুনের রথের চালনা ভার গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের পরম মহত্ত্বপূর্ণ প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তরূপে বিশ্ববন্দিত গোপীদের প্রীত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যনিয়ত মনোনিবেশ করে থাকেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে জীবগণ গুণগতভাবে অবিচ্ছেদ্য অংশ না হলে শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ প্রেমভাব বিনিময় সম্ভব হত না। অপরদিকে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং জীবগণ যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ সচেতন ব্যক্তিসত্ত্বা নিয়ে, ভগবানের রাজ্যে প্রেমবিনিময় করে থাকেন, তাই এই লীলা নিত্য বাস্তব। ভাষান্তরে বলা চলে, শ্রীভগবানের সাথে পরম একাত্মতা এবং ভগবানের সত্ত্বা থেকে পরম ভিন্নতা কষ্টকল্পিত দর্শনতত্ত্বের বিভিন্ন ভাবধারার তাত্ত্বিক কল্পনা মাত্র। এই শ্লোকে যেভাবে চিন্ময় প্রেমের সার্থকতা বর্ণনা করা হয়েছে, তা একই সঙ্গে একাত্মতা এবং ভিন্নতার সত্ত্বা-নির্ভর হয়ে থাকে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রহ্মণ্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে স্বয়ং এই পরম সত্ত্বা বিস্তারিত লীলাবিস্তারের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণ অগণিত শাস্ত্র গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে এই যথার্থ ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই ভাবধারা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক উপদেশাবলীর অঙ্গীভূত হয়ে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে, এবং তিনিই এই জ্ঞানসম্পন্ন অতীব সুচারুরূপে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের কাছে যথাযথ বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আমাদের বর্তমান সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র তাঁর রচিত *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদ ও ভাষ্য পরিবেশনার ব্রত সম্পূর্ণ করতে অভিলাষী হয়েছি, এবং তাঁরই পথনির্দেশের জন্য নিত্য প্রার্থনা নিবেদন করে থাকি যাতে এই ব্রত তিনি স্বয়ং যেভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আমরা সেইভাবে তা সম্পূর্ণ করতে পারি। পাশ্চাত্য দেশগুলির ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাসত্তার যেভাবে পরিবেশিত হয়ে চলেছে, সেইভাবে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা এবং ভারতবাসীরাও যদি তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে শ্রীভগবান অবশ্যই তেমন চিন্ময় তত্ত্বের পরম অনুসন্ধিৎসু মানুষদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীনারদ উবাচ

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এবম্**—তাই; **তে**—তাঁরা; **নিমিনা**—নিমিরাজা কর্তৃক; **পৃষ্টাঃ**—প্রশ্ন করলেন; **বসুদেব**—হে বসুদেব; **মহৎ-তমাঃ**—মুনিবরগণ; **প্রতিপূজ্য**—তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে বলেছিলেন; **অব্রুবন্**—তাঁরা বললেন; **প্রীত্যা**—প্রীতিপূর্বক; **সসদস্য**—যজ্ঞে সমবেত সকলের সঙ্গে; **ঋত্বিজম্**—ঋত্বিক পূজারীগণ; **নৃপম্**—রাজাকে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে বসুদেব, যখন মহারাজ নিমি এইভাবে নয়জন যোগেন্দ্র ঋষিবর্গের কাছে ভগবদ্ভক্তি সেবা সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভাবশালী মুনিগণ প্রীতিসহকারে রাজাকে অভিনন্দিত করলেন এবং যজ্ঞে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণ ঋত্বিকগণকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ধর স্বামীর মতানুসারে, শুধুমাত্র রাজা নিমি নন, যজ্ঞে সমবেত সকলে এবং যজ্ঞের হোতা পূজারীগণও সকলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদনের মাহাত্ম্য কীর্তন শুনতে আগ্রহী ছিলেন। শ্রীকবি প্রমুখ মুনিগণ এবার পর্যায়ক্রমে রাজার প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রীকবিরুবাচ

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্ ।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকবিঃ উবাচ—শ্রীকবি বললেন; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অকুতশ্চিৎ-ভয়ম্**—নির্ভয়; **অচ্যুতস্য**—অচ্যুত অক্ষয় শ্রীভগবান; **পাদ-অম্বুজ**—পাদপদ্ম; **উপাসনম্**—উপাসনা; **অত্র**—এই জগতে; **নিত্যম্**—সদাসর্বদা; **উদ্বিগ্ন-বুদ্ধেঃ**—যার বুদ্ধি বিপর্যস্ত; **অসৎ**—অনিত্য; **আত্ম-ভাবাৎ**—নিজ দেহটিতে আত্মস্বরূপ ভ্রান্তিবশত; **বিশ্ব-আত্মনঃ**—সর্বপ্রকারে; **যত্র**—যার মাধ্যমে (ভগবৎ-সেবার); **নিবর্ততে**—নিবৃত্তি হয়; **ভীঃ**—ভয়।

অনুবাদ

শ্রীকবি বললেন—হে রাজন! এই জগৎ-সংসারে দেহাদি অসৎ বিষয়ে নিরন্তর আত্মবুদ্ধি স্বরূপ বিভ্রান্তির জন্যই মানুষের কল্যাণার্থে আমি মনে করি যে, মানুষ

শুধুমাত্র অচ্যুত অক্ষয় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মের আরাধনা করলেই সর্বপ্রকার ভয় ভীতির কবল থেকে যথার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সকল ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমত অনুযায়ী, *অসৎ-আত্ম-ভাবাৎ* শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে নির্দেশ করছে যে, প্রত্যেক জীব সদাসর্বদাই ভয়ভীত হয়ে বিব্রত থাকে, কারণ তার নিত্য সত্য আত্ম-স্বরূপটিকে অস্থায়ী অনিত্য জড় জাগতিক দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সঙ্গে একাত্ম ভ্রান্তি পোষণ করতে থাকে।

ঠিক এইভাবেই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উল্লেখ করেছেন যে, *ভক্তিপ্রতিকূল দেহগেহাদিষ্বাসক্তিম্*—অনিত্য অস্থায়ী দেহ এবং গৃহ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মানুষের আসক্তির ফলে, তার বুদ্ধিবৃত্তি সদাসর্বদাই ভয়ে বিব্রত হয়ে থাকে, এবং তার জন্যই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ মনে ভক্তি নিবেদনের সেবা অনুশীলন করতে কিংবা তার সার্থকতা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়।

দেহাত্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত ধর্মাচরণ বলতে যা বোঝায়, সেইগুলির মধ্যে চূড়ান্ত ফললাভ সম্পর্কে দ্বিধা এবং আশঙ্কা অনেক থাকে। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমভক্তিমূলক সেবার উদ্যোগে মানুষ ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি অনুভব করতে থাকে, কারণ ভগবদ্ভক্তি যে বৈকুণ্ঠ তথা চিন্ময় পর্যায়ে অনুশীলন করা হয়, সেখানে কোনও ভয় বা আতঙ্কের স্থান হয় না।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, ভক্তিযোগের পদ্ধতি এমনই শক্তিশালী যে, সাধন-ভক্তির মাধ্যমে যখন মানুষ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাকে, এবং নানা প্রকার বিধিনিয়ম পালন করে চলে, তখনও শ্রীভগবানের কৃপায় ভয়শূন্যতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কনিষ্ঠ ভক্তও অনুভব করতে থাকে। মানুষের মনে ভগবদ্ভক্তি যতই পরিণত হয়ে ওঠে, ততই শ্রীভগবান স্বয়ং তার কাছে প্রতিভাত উঠতে থাকেন, এবং চিরতরে সকল ভয়ভাব দূর হয়ে যায়।

শ্রীভগবানের সেবা অভিলাষের প্রবণতা সকল জীবেরই রয়েছে, কিন্তু অনিত্য অস্থায়ী শরীরের সঙ্গে বৃথা আত্মসম্বন্ধ বোধ থাকার ফলেই জীব তার শুদ্ধ স্বরূপগত প্রবণতার সাথে সম্পর্ক হারায়, ফলে দেহ, গৃহ, পরিবার পরিজন এবং এই ধরনের অস্থায়ী সম্বন্ধ-সম্পর্কাদির সঙ্গে অস্থায়ী ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির লোভময় আত্মীয়তা গড়ে তোলে। এই রকম ভিত্তিহীন আসক্তির ফল হয় অনবরত দুঃখ কষ্ট, যার নিরসন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা নিবেদনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥

"হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম জাগতিক চিন্তায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তারা সর্বদাই ভয়ভীত হয়ে থাকে। তারা সর্বক্ষণ তাদের ধনসম্পদ, দেহ-গৃহ এবং আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বক্ষণ শোক এবং অবৈধ বাসনায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। 'আমি' এবং 'আমার' এই ধরনের নশ্বর ধারণার ভিত্তিতে লোভের বশবর্তী হয়ে তারা নানাবিধ উদ্যোগ করে থাকে। যতক্ষণ তারা আপনার নিরাপদ শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততক্ষণ এই ধরনের দুশ্চিন্তায় তারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/৯/৬)

শ্লোক ৩৪

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে ।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥ ৩৪ ॥

যে—যে; **বৈ**—অবশ্য; **ভগবতা**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—কথিত; **উপায়াঃ**—উপায়ে; **হি**—অবশ্য; **আত্মলব্ধয়ে**—পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **পুংসাম্**—মানুষের দ্বারা; **অবিদুষাম্**—অজ্ঞ; **বিদ্ধি**—জানে; **ভাগবতান্**—ভাগবত ধর্ম রূপে; **হি**—অবশ্যই; **তান্**—এই সকল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং যে সকল পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন, তা অনুসরণ করলে অজ্ঞ জনও পরমেশ্বর ভগবানকে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাকে ভাগবত-ধর্ম অর্থাৎ, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রেমভক্তি নিবেদনের উপায় স্বরূপ স্বীকার করতে হয়।

তাৎপর্য

মনুসংহিতার মতো বহু বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার আছে, যেগুলির মধ্যে মানব সমাজের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিধিসঙ্গত অনুশাসনাদি উপস্থাপিত হয়েছে। ঐ ধরনের বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান মূলত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে অর্থাৎ মানব

সমাজকে যথাযথ সমাজবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে চারটি বর্ণ তথা বিভিন্ন সামাজিক কর্মজীবিকা অনুসারে এবং চারটি আশ্রম তথা বিভিন্ন পারমার্থিক বিকাশমূলক পর্যায় অনুসারে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অবশ্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গড়ে তোলার উপযোগী যে জ্ঞান অনুশীলন করা হয়, তাকে বলা যেতে পারে *অতিরহস্যম্*, অর্থাৎ অতীব গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান (*অতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতাবিদুষাম্ অপি পুংসাম্ অঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধে*)।

ভাগবত-ধর্ম এমনই গূঢ় বিষয় যে, স্বয়ং ভগবান তা বিবৃত করেছেন। *ভাগবত-ধর্মের* সারমর্ম *ভগবদ্গীতার* মধ্যে দেওয়া হয়েছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান এই প্রসঙ্গে উদ্ধবকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে অর্জুনের প্রতি প্রদত্ত উপদেশাবলীর চেয়েও বিস্তারিতভাবে জ্ঞান উন্মেষ সাধন করতে পারে। তাই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতা* উপদেশ দিয়েছিলেন শুধু অর্জুনকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এবং *ভগবদ্গীতার* সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান পূর্ণ করার জন্য তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীভগবান অভিলাষ করেছিলেন, তিনি যে-জ্ঞান *ভগবদ্গীতায়* বলেননি, সেই জ্ঞান সম্ভার যেন শ্রীউদ্ধব বিতরণ করেন।" (*ভাগবত* ৩/৪/৩২ তাৎপর্য)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, জীবগণ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পরিভ্রমণ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানের সকল চিন্তাসূত্র বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তারা পরমেশ্বর ভগবানের মুখনিঃসৃত নিত্যকালের শুভপ্রদ বিষয়াদি তাদের কল্যাণার্থে শ্রবণ করে, তখন পরমাত্মারূপে তাদের নিত্যকালের পরিচয় উপলব্ধি করতে পারে এবং *ভাগবত-ধর্মের* ভিত্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের দাস তথা সেবকরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে। শুদ্ধ বৈষ্ণব তথা ভগবৎ-সেবক রূপে জীবাত্মার এই জ্ঞানলাভের মাধ্যমে নিজেকে শ্রীভগবানের থেকে ভিন্ন কিংবা শ্রীভগবানের সমকক্ষ মনে করার কোনও সার্থকতা নেই, এমন কি জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির রাজ্যেও ভগবদ্ভক্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি সেবার বিষয় নিয়ে সবিশেষ ভাবিত থাকেন এবং নিজেকে পরমতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে উপলব্ধি করেন। শুদ্ধভক্ত উপলব্ধি করতে থাকেন যে, পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবানের কোনও এক প্রত্যক্ষ অংশ প্রকাশের মতোই তিনি যেন প্রেমরজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আর, তেমনই সার্থক সিদ্ধিসম্পন্ন

শুদ্ধ চেতনার মাঝেই ভক্তগণ পরমতত্ত্বের সর্বত্র বিস্তারী বিবিধ প্রকার রূপের অনুভূতি লাভ করে থাকেন।

শ্লোক ৩৫

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৩৫ ॥

যান্—যার অর্থ; **আস্থায়**—আশ্রিত; **নরঃ**—মানুষ; **রাজন্**—হে রাজা; **ন প্রমাদ্যেত**—বিঘ্নিত হন না; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **ধাবন্**—ধাবিত হয়ে; **নিমীল্য**—বন্ধ করে; **বা**—কিংবা; **নেত্রে**—তার চোখগুলি; **ন স্খলেৎ**—স্খলিত হবে না; **ন পতেৎ**—পতিত হবে না; **ইহ**—এই ভাগবত ধর্মের পথে।

অনুবাদ

হে রাজা, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতির মাধ্যমে যে-মানুষ আশ্রয় খোঁজে, এই পৃথিবীতে সে কখনই তার গন্তব্যপথে বিভ্রান্ত হবে না। এমন কি, চোখ বন্ধ করে পথ চললেও তার কখনই পদস্খলন হবে না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যবহৃত *অঞ্জঃ* (অনায়াসে) শব্দটি এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, *অঞ্জঃ পদেনোক্তং সুকরত্বং বিবৃণোতি*—"*অঞ্জঃ* শব্দটির মাধ্যমে ভক্তিযোগ সাধনের সাবলীল সহজ পন্থার বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং বর্তমান শ্লোকটিতে সেই বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হবে।" *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) স্বয়ং শ্রীভগবান বলছেন, *প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্*—"পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান কখনই বিনষ্ট হয় না এবং এই ভগবদ্ভক্তি সাধন প্রক্রিয়া খুবই আনন্দময় ও সুখসাধ্য।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "ভক্তিযোগের পথ অত্যন্ত সুখসাধ্য (*সুসুখম্*)। কেন? ভক্তিযোগের অঙ্গ *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন অথবা প্রামাণিক আচার্যদের দিব্যজ্ঞান সমন্বিত দার্শনিক প্রবচন শোনার মাধ্যমে ভক্তিযোগ মহানন্দে এবং স্বাভাবিকভাবেই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বসে বসেই এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়, তদুপরি শ্রীভগবানের সুস্বাদু প্রসাদ আস্বাদন করা যায়। যে কোন অবস্থাতেই ভক্তিযোগ অনুশীলন খুবই আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। চরম দারিদ্র্যের মাঝেও

ভগবদ্ভক্তিযোগ সাধন করা যায়। শ্রীভগবান বলেছেন, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্* —ভক্তের নিবেদিত সব কিছুই তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তা যত সামান্যই হোক, তাতে তিনি কিছু মনে করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল, জল পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে কেউ ভগবানকে তা প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করতে পারে। ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানকে যা কিছু অর্পণ করা হয়, তাই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন: ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর সৌরভ শুধুমাত্র ঘ্রাণ করে সনৎকুমার আদি মহর্ষিরা মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অতি উত্তম এবং অত্যন্ত সুখসাধ্য। শ্রীভগবানকে আমরা যা কিছুই নিবেদন করি, তিনি কেবল আমাদের ভক্তিটুকুই গ্রহণ করে থাকেন।"

এখানে যে মূল্যবান বিষয়টি উপলব্ধি করা দরকার, তা হল এই যে, কোনও জীব যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, "হে ভগবান, যদিও আমি অত্যন্ত পাপী এবং অযোগ্য, আর এতকাল আপনাকে আমি বিস্মৃত হয়ে থাকার চেষ্টা করেছিলাম, তবুও আমি এখন আপনার শ্রীচরণপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করছি। আজ থেকে আমি আপনার সেবক। আমার যা কিছু আছে—আমার দেহ, মন, বাক্য, পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ—আমি সবই এখন তোমার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করছি। কৃপা করে আমার সব কিছু নিয়ে আমাকে যেভাবে ইচ্ছা, আপনি নিয়োজিত করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মধ্যে বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধরনের আত্মসমর্পিত জীবকে সর্বথা রক্ষা করেন এবং তাকে চিরজীবনের মতো শ্রীভগবানের আপন রাজ্য ভগবদ্ধামে জীবের নিজ নিকেতনে ফিরিয়ে নিয়েই যান। সুতরাং শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের এই যোগ্যতা অর্জন করে যে কোনও জীব এমনই বিপুল পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে সেই আত্মনিবেদিত জীব ধর্ম জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতই নিম্নগামী হোক, তার ঊর্ধ্বগামী মর্যাদা স্বয়ং শ্রীভগবানই রক্ষা করতে থাকেন।

অবশ্য, যোগ অভ্যাসের অন্যান্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যেহেতু নিজের প্রতিজ্ঞা এবং বুদ্ধিবৃত্তির ভরসায় চলতে থাকে, আর যথার্থভাবে শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণের অভিলাষ করে না, তাই তার নিজের অস্বচ্ছ, সীমিত শক্তি সামর্থ্যের ভরসায় চলার দরুন তার পক্ষে যে কোনও মুহূর্তে অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে।

এই কারণেই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ। পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের

শ্রীচরণকমলের আশ্রয় বর্জন করে তার পরিবর্তে নিজের শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞানের ভরসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হতে প্রয়াসী হয়, তবে সুনিশ্চিতভাবেই অতি সাধারণ পর্যায়ের জড়জাগতিক স্তরে সে অধঃপতিত হবে, কারণ তার নিজের নশ্বর সামর্থ্য তাকে চিরকাল কখনই রক্ষা করতে পারে না।

এই কারণেই বৈষ্ণব আচার্যগণ এই শ্লোকটির ভাষ্য নিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত সহকারে নানাভাবে ভক্তিযোগের তথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন, *নিমীল্যানেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনম্ নামাজ্ঞানং যথাহুঃ-'শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যাম্ অন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ'* ইতি—"দু'চোখ বন্ধ করে দৌড়ালেও *ভাগবত-ধর্ম* অনুশীলনের পথে ভক্তের পদস্খলন হবে না। 'এক চক্ষু বন্ধ করে চলা' বলতে প্রতিষ্ঠিত বৈদিক শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অজ্ঞতা বোঝায়। তাই বলা হয়েছে, 'শ্রুতি' এবং 'স্মৃতি' শাস্ত্র দুটি ব্রাহ্মণদের দুটি চক্ষুর মতো মূল্যবান। তার মধ্যে একটিরও অভাব হলে, ব্রাহ্মণ অর্ধেক অন্ধ হয়ে পড়ে, এবং দুটির অভাব হলে, তাকে সম্পূর্ণ অন্ধ বলে মানতে হবে।' "

ভগবদ্গীতায় (১০/১০-১১) শ্রীভগবান সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্ত যদি বৈদিক জ্ঞান অর্জনে অক্ষম হয় কিংবা বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে, তা সত্ত্বেও যদি সে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিসেবায় যথার্থ নিয়োজিত হয়, শ্রীভগবান স্বয়ং তা হলে ভক্তের হৃদয়াভ্যন্তর থেকে তাকে উদ্দীপিত করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—কীর্তন প্রচার করছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হয়েছিল। বারাণসীর অতি প্রভাবশালী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভাবুক বলে উপহাস করেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কখনও ভগবদ্ভক্তের সমালোচনা করে থাকে, কারণ তারা মনে করে যে, অধিকাংশ ভক্তেরাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং তত্ত্বদর্শনে অনভিজ্ঞ, ভাবুক। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ভক্তিতত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে গেছেন, তবে তা সত্ত্বেও যদি কোনও ভক্ত এই সমস্ত শাস্ত্রসম্ভার অথবা সদ্গুরুর সাহায্যও গ্রহণ না করেন, কিন্তু যদি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের সেবা করেন, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অন্তর থেকে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত

নিষ্ঠাবান ভক্ত কখনই তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হন না। তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ভক্তি নিবেদন করাই একমাত্র যোগ্যতা।"

শ্রীভগবানের এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদ্ভক্তির নামে প্রেমময় ভক্তিসেবার পদ্ধতি নিয়ে অযথা স্বকপোলকল্পিত আচরণের কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, *ভগবৎ প্রাপ্ত্যর্থং পৃথগ্মার্গকরণস্তুতি দূষণাবহমেব*—"পরমেশ্বর ভগবানের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে যদি কেউ ভগবদ্ভক্তি সেবা সম্পর্কিত বিষয়ে নিজের মনোমত কোনও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, তবে সেই ধরনের স্বকপোলকল্পনার ফলে সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম প্রেমভক্তি নিবেদন বলতে যা বোঝায়, তা যদি *শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি* এবং *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্রাদির মধ্যে নির্দেশিত বিধিনিয়মাদি বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য না করে, তা হলে সমাজের পক্ষে সেটি উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে।" ভাষান্তরে বলা চলে, কেউ বৈদিক শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত না হলেও, শ্রীভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবা অনুশীলনে যদি সে নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োজিত হয়ে থাকে, তবে তাকে শুদ্ধ ভক্ত রূপে স্বীকার করতে হবে; তবে তা হলেও প্রামাণ্য শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি কোনওভাবেই তেমন প্রেমভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে লঙ্ঘন করা চলবে না।

প্রাকৃত সহজিয়াদের মতো গোষ্ঠীরা বৈষ্ণবধর্মের সর্বজনস্বীকৃত বিধিনিয়মাদি অবহেলা করে থাকে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিভাবের নামে রাধা-কৃষ্ণের মতো বেশভূষা ধারণ করে অবৈধ তথা ঘৃণ্য কাজ করতে থাকে। স্বয়ং ভগবান যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমভক্তির অভিপ্রকাশ করেন, তাই তারাও ঐ ধরনের ভাব অনুকরণে দাবী করে থাকে, অথচ প্রামাণ্য সর্বজনস্বীকৃত শাস্ত্রীয় নিয়মাদি অনুসরণ করতে চায় না।

ঠিক এইভাবেই, সারা জগতে এমন কপট ধর্মাচরণকারীরা ছড়িয়ে পড়েছে, যারা নিজেদের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে থাকে আর জাহির করে বলে যে, তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্বয়ং শ্রীভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করছে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, হৃদয়ের মাঝে শ্রীভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিকাশের কথা বলতে গিয়ে ভগবদ্ভক্তির নিত্যকালের পদ্ধতি বদল করা চলে না, বরং নিষ্ঠাবান ভক্ত প্রামাণ্য শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হলে, তাকে পরিপূরক সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হয়, এই বিষয়টি উপলব্ধি করাই প্রয়োজন।

ভাষান্তরে বলা চলে, প্রামাণ্য দিব্য শাস্ত্রাদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের নিত্য প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেহেতু শ্রীভগবান নিত্য স্বরূপ এবং জীবও নিত্য স্বরূপ, তাই উভয়ের মাঝে প্রেমময় মধুর সম্পর্কও নিত্য স্থিত। শ্রীভগবান কখনই তাঁর স্বরূপ প্রকৃতির পরিবর্তন করেন না, সেইভাবে জীবের স্বরূপ প্রকৃতিও অপরিবর্তনীয়। তাই, ভগবদ্ভক্তির প্রেমময় স্বরূপ প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের কোনই প্রয়োজন হয় না। শ্রীভগবানের বিশেষ স্বরূপ প্রকাশের মাধ্যমে শাস্ত্রজ্ঞান উন্মোচিত হয়, তাতে শাস্ত্রজ্ঞানের বিরোধিতা হয় না।

অন্যভাবে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোনও ভক্ত ভক্তিযোগের মূল নীতিগুলি সবই যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন এবং ভগবদ্ভক্তি সেবার পথে অগ্রসর হতে পারেন, তা হলে সেই ধরনের বৈষ্ণবজন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসরণে অবহেলা করছেন বলে সমালোচনা করা অনুচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের জন্য শত শত পারমার্থিক অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইসব কেন্দ্রগুলিতে ভক্তরা অবৈধ নারী-পুরুষসঙ্গ দোষ, জুয়া খেলা, নেশা ভাং এবং আমিষ আহার বর্জন করে এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর আত্মনিয়োগ করে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদের এই ধরনের অনুগামীরা বিস্ময়কর পারমার্থিক উন্নতি লাভ করে এবং ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলনে বহু সহস্র মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।

বাস্তবিকই, ইসকনের সমস্ত নিষ্ঠাবান সদস্যেরাই যাঁরা প্রথাবদ্ধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করে চলেন, তাঁরা জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত থাকেন এবং ভগবদ্ধামে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পথে সুস্পষ্টভাবেই এগিয়ে চলতে পারেন, তা লক্ষ্য করা গেছে। ইসকনের ঐ ধরনের সদস্যগণ হয়ত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথামতো সব কিছু নিয়মনীতি পালন করে চলতে পারেন না। বাস্তবিকই, বহু পশ্চিমী ভক্ত খুব সামান্যই সংস্কৃত শব্দাবলী উচ্চারণ করতে পারেন এবং তাই মন্ত্রোচ্চারণ করে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে বিশদ প্রক্রিয়া অনুসারে যজ্ঞাদি সম্পাদনে তাঁরা খুব দক্ষ নন। যেহেতু তাঁরা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করে ভক্তিযোগের অত্যাবশ্যকীয় বিধিনিয়মাদি সবই পালন করে চলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি অনুশীলনে নিরন্তর নিয়োজিত থাকেন, তাই ইহজীবনে এবং পরজন্মে তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদা সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

আধুনিক ভাবধারায় সুপণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ এবং বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে সুনিপুণ এমন অনেক মানুষ আমরা দেখেছি, যারা মানবজীবনের মূল নীতিগুলিও তেমন

মেনে চলে না—যেমন, অবৈধ নারীসংসর্গ, আমিষ আহার, জুয়া খেলা এবং নেশাভাং বর্জন। ঐ ধরনের প্রতিভাবান পণ্ডিতেরা এবং যাগযজ্ঞ ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানকারীরা সাধারণত জড়জাগতিক জীবনধারায় আসক্ত হয়েই থাকে এবং তারা স্বকপোলকল্পনা পছন্দ করে। যদিও *ভগবদ্গীতার* মধ্যে শ্রীভগবান স্বয়ং নিত্যকালের যথার্থ জ্ঞান প্রদান করেছেন, তা সত্ত্বেও ঐ সব পণ্ডিতম্মন্য মানুষগুলি শ্রীভগবানের চেয়েও নিজেদের খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করে এবং বৈদিক শাস্ত্রাদির অর্থ নিয়ে স্বকপোলকল্পিত ভাবধারা প্রচার করতে থাকে। ঐ ধরনের কল্পিত ভাবধারা অবশ্যই যথার্থ পারমার্থিক জীবনচর্যার পথ থেকে পতনের সূচনা করে, এবং তাদের জড়জাগতিক কর্মফলাশ্রিত কার্যাবলী সম্পর্কে আর কী বলার আছে, কারণ ঐগুলি সবই একেবারেই মায়াময় বিভ্রান্তিকর বলতে যা বোঝায়, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। পারমার্থিক ভাবধারায় সঞ্জীবিত ভগবদ্ভক্তেরা ফলাশ্রিত ক্রিয়াকর্মের এবং মনগড়া ভাবধারায় দূষণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হন, এবং এই শ্লোকটির সেটাই বিশেষ মূল্যবান তাৎপর্য বলে স্বীকার করতে হবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সতর্ক করে দিয়েছেন—*যান্ আস্থায়* শব্দসমষ্টির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তিযোগের মূল বিধিনিয়মগুলি যে মেনে চলে না, তাকে কখনই একজন বৈষ্ণবের মতো মহান মর্যাদা প্রদান করা চলে না। এমন কি, যারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভজনা করছে, আবার কখনও কল্পনাশ্রিত কিংবা ফলাশ্রিত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা মায়ার সেবা অনুশীলন করছে, তাকেও বৈষ্ণব পদবাচ্য করা চলে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, "ভাগবত ধর্ম ছাড়া অন্য সকল প্রকার ধর্মাচরণে বদ্ধ জীবের বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিচার্য। কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে আত্মনিবেদিত কোনও জীব অন্য সকল প্রকার বিষয়ে অনভিজ্ঞ তথা অপারদর্শী হলেও, ভুলভ্রান্তিবশত কখনই হতবুদ্ধি হন না। কখনই তাঁকে বিচলিত হতে হয় না, কখনও তাঁর পতনও হয় না। যত্রতত্র পৃথিবীর যেখানে খুশি বিচরণ করতে থাকলেও, তাঁর অবিচল সেবা আরাধনার প্রভাবে সর্বদাই তিনি এক শুভপ্রদ মঙ্গলময় অবস্থান লাভ করে থাকেন। জগতের অন্য কোনও ধর্মাবলীর মধ্যে ভাগবত ধর্মের এই অনন্য ক্ষমতা উপলব্ধ হয় না। যে আত্মসমর্পিত ভক্তগণ ভাগবত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে অন্য কোনও ধর্মের অনুশীলনকারীর কোনই তুলনা করা চলে না।

শ্লোক ৩৬

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ৩৬ ॥

কায়েন—শরীরের সাহায্যে; **বাচা**—বাক্য; **মনসা**—মন; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **বা**—কিংবা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মনা**—শুদ্ধ চিত্তে; **বা**—অথবা; **অনুসৃত**—অনুসরণ করে; **স্বভাবাৎ**—বদ্ধ জীবনের স্বভাব অনুযায়ী; **করোতি**—করে থাকে; **যৎ যৎ**—যেভাবেই; **সকলম্**—সমস্ত; **পরস্মৈ**—পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে; **নারায়ণায় ইতি**—'এই সবই শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে' এমন চিন্তা করে; **সমর্পয়েৎ**—সমর্পণ করতে হয়; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবনধারার মাঝে নিজ নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী, মানুষ তার দেহ, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা যা কিছু করে, তা সবই "ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে করছি", এই ভাবনায় উৎসর্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যে-মানুষ তার শরীর, মন, বাক্য, বুদ্ধি, অহম্-বোধ এবং চেতনা সব কিছু নিয়োজিত রাখে, তার সঙ্গে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিসর্বস্ব কাজে নিয়োজিত কর্মী-সাধারণের সমপর্যায়ে বিবেচনা করা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে এখনও বদ্ধ জীব মনে হলেও, যারা তাঁর সকল ক্রিয়াকর্মের ফল লাভ সবই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে থাকে, তাকে জড়জাগতিক কাজকর্মের ফলাফল স্বরূপ অগণিত দুঃখ-কষ্ট আর স্পর্শ করতে পারে না।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাবাপন্ন তথা বিমুখ হয়ে থাকার ফলেই, বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের আদেশ নির্দেশাদির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। তবে স্বরূপ-সচেতন জীবমাত্রেই এই জগতের মধ্যে সকল প্রকার কাজকর্ম পরমেশ্বর ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্পণের মাধ্যমেই সম্পন্ন করে চলে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, যে সমস্ত কর্মী যথার্থ পুণ্যবান, তাঁরা শ্রীভগবানের চরণকমলে তাঁদের সকল কর্তব্যকর্মের ফলাফল সমর্পণ করবার প্রয়াসী হওয়ার মাধ্যমে সুকৃতিবান জীবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেন। যদিও এই প্রকার আচরণকে *কর্মমিশ্রা* ভক্তি, তথা ফলাকাঙ্ক্ষী কাজকর্ম সম্পাদনের

সাথেই ভগবদ্ভক্তি সেবা নিবেদনের অভিলাষ বলেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের কর্মোদ্যোগ মিশ্রিত ভগবদ্ভক্তির উদ্যোগ থেকেই ক্রমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। "নিজের কষ্টোপার্জিত সুফল ভোগ করবার" মিথ্যা জীবনদর্শন থেকে ক্রমশ ধর্মপ্রাণ ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীরা যতই নিজেদের সরিয়ে নিতে থাকেন, ততই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার সুফল তাঁদের জীবনকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করে তোলে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন, *আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ*—যদিও কোনও জীব দেহাত্মবুদ্ধির জীবনদর্শনে মগ্ন থাকে, তা সত্ত্বেও তার সকল কর্মের ফল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা উচিত। যাদের মনে পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে আদিম, জড় অস্তিত্বমূলক ধারণা রয়েছে, তাদের ধারণা শ্রীভগবান শুধুমাত্র মন্দিরে বা গির্জায় থাকেন। উপাসনার জায়গায় গিয়ে তারা খানিকটা শ্রদ্ধা নিবেদন করে, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে তারা কর্তৃত্ব করতে চায়, তাই চিন্তা করে না যে, শ্রীভগবান সর্বত্রই রয়েছেন, এবং প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মপ্রাণ বলেই পরিচিত কিন্তু যদি তাঁদের ছেলে-মেয়েরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হতে চেষ্টা করে, অমনি তাঁরা ভারি বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, ভগবানকে যা কিছু একটা সামান্য জিনিস দিলেই খুশি করা যাবে, কিন্তু আমার পরিবার-পরিজন আর সাধারণ কাজ-কারবার সবই আমার জিনিস আর আমার দখলে থাকুক।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কিছুর ধারণা করা কিংবা তার প্রভুত্ব স্বীকার না করার অর্থ মায়া। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উদ্ধৃতি দিয়েছেন, *ন কেবলং বিধিতঃ কৃতম্ এবেতি নিয়মঃ। স্বভাবানুসারী লৌকিকম্ অপি*—"শুধুমাত্র বিধিসম্মত ধর্মাচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান আর নিয়মনিষ্ঠাই নয়, এই জগতে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কৃতকর্ম নিবেদন করা উচিত।"

এই শ্লোকের মধ্যে *করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ* শব্দগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনুরূপ একটি শ্লোক *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) পাওয়া যায়—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র অর্জুন), তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম যজ্ঞ কর এবং যেভাবেই তপস্যা কর, তা সমস্তই আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর।"

আপত্তি উঠতে পারে, যেহেতু আমাদের অতি সাধারণ কাজকর্ম সবই আমাদের জড়জাগতিক দেহ এবং জড় জাগতিক মনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে চিন্ময় আত্মার ভূমিকা থাকে না, তা হলে সেই ধরনের কাজকর্ম কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সমর্পণ করা চলে, তিনি তো জড়জাগতিক পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে বিরাজ করে থাকেন? আমাদের সেই সমস্ত কাজকর্মগুলি কেমনভাবে চিন্ময় হয়ে উঠতে পারে? এর উত্তরে *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৮) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণপরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যং তত্তোষকারণম্ ॥

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যে সন্তুষ্ট করতে চায়, তাকে অবশ্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করতে হবে এবং তার নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম পালনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে হবে।

ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।* সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যদি কেউ তার সকল কর্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে, তা হলে সেই কাজ ভগবৎ-সেবা রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাব অর্থাৎ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী, মানুষ বুদ্ধিজীবী কিংবা পূজারী পুরোহিত হয়ে কাজ করতে পারে, কেউ প্রশাসক কিংবা সেনাবাহিনীর কাজে দক্ষ হতে পারে, কৃষিকাজে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে, কিংবা শ্রমমূলক কাজে বা শিল্পসৃষ্টিতে অভিজ্ঞ হতে পারে। আর সেই সব কাজ করতে করতে, প্রত্যেকেরই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত এবং চিন্তা করা দরকার—*যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়*—আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যেই কাজ করছি। আমার কাজ থেকে যা কিছু ফল লাভ হয়, তা থেকে আমার ভরণপোষণের জন্য যৎ সামান্যই গ্রহণ করব, এবং বাকি সবই শ্রীনারায়ণের মহিমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমি নিবেদন করব।"

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন, *কামিনাং তু সর্বথৈব ন দুষ্কর্মার্পণম্*—পরমেশ্বর ভগবানকে দুষ্কর্মাদি অর্থাৎ পাপময় তথা দুষ্ট আচরণ কেউ সমর্পণ করতে পারে না। সমস্ত পাপকর্মের জীবনে চারটি স্তম্ভ থাকে, সেগুলি অবৈধ নারী-পুরুষ সংসর্গ, আমিষ আহার, জুয়াখেলা, আর নেশাভাং করা। এই সমস্ত কাজকর্ম কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ পেশা

কীর্তনেও অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সে স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির পর্যায়ে উপনীত হয়, যেখানে যথার্থ ভক্তিভাব দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে যে, কোনও সৎ নাগরিক সরকারকে খাজনা দিলেও, সরকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা তার নেতাদের সে হয়ত ভাল না বাসতেও পারে। সেইভাবেই, কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, সে শ্রীভগবানেরই বিধিনিয়মের অধীন হয়ে সব কাজ করছে এবং বৈদিক অনুশাসনাদি কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রাদির অনুশাসন মতো সে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তার ধনসম্পদের একাংশ উৎসর্গ করে থাকে। তবে যখন কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ যথার্থই শ্রীভগবানের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে জপকীর্তন এবং মাহাত্ম্য শ্রবণে বাস্তবিকই আকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং এইভাবে তার ভগবৎ-প্রেমের অভিপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, তখন জীবনের পরম সিদ্ধির পর্যায়ে সে উপনীত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বিভিন্ন শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করে অতি মনোরমভাবে ভগবৎ-প্রেম বিকাশের প্রক্রিয়া অভিব্যক্ত করেছেন। *অনেন দুর্বাসনা দুঃখদর্শনেন স করুণাময়ঃ করুণাং করোতু* "করুণাময় শ্রীভগবান যেন আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সকল পাপকর্মাদির দ্বারা সৃষ্ট দুঃখকষ্ট প্রতিভাত করেন।" *যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু*— "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদির প্রতি বুদ্ধিহীন মানুষদের প্রগাঢ় প্রীতি জন্মায়। তেমনই, আমি যেন আপনাকে এমনভাবে সদাসর্বদা স্মরণ মনন করতে পারি, যার ফলে আপনার প্রতি ঐ ধরনেরই আসক্তি কখনই আমার অন্তর থেকে চলে না যায়।" (*বিষ্ণুপুরাণ* ১/২০/১৯) *যুবতীনাং যথা যূনি যূনাং চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্ মনো মে রমতাং ত্বয়ি*—"যেভাবে যুবতীদের মন কোনও যুবকের চিন্তা করতে আনন্দ লাভ করে আর যুবকদেরও মন কোনও যুবতীর কথা ভাবতে ভালবাসে, তেমনই আপনারই চিন্তায় যেন আমার মন আনন্দ পেতে পারে।" *মম সুকর্মণি দুষ্কর্মণি চ যদ্রাগসামান্যম্, তদ্ সর্বতোভাবেন ভগবদ্বিষয়মেব ভবতু*—"পুণ্য অথবা পাপকর্মে আমার যত আসক্তিই হোক, তা সবই যেন সর্বান্তঃকরণে আপনারই মাঝে সমর্পিত হয়ে যায়।"

শ্লোক ৩৭

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ
ঈশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩৭ ॥

ভয়ম্—ভয়; **দ্বিতীয়**—শ্রীভগবান অপেক্ষা ভিন্ন কোনও বিষয়ে; **অভিনিবেশতঃ**—মনঃসংযোগের ফলে; **স্যাৎ**—সৃষ্টি হবে; **ঈশাৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের থেকে; **অপেতস্য**—বিমুখ; **বিপর্যয়ঃ**—আত্মবিস্মৃতি; **অস্মৃতিঃ**—স্বরূপ বিভ্রান্তি; **তৎ**—শ্রীভগবানের; **মায়য়া**—মায়ার শক্তি দ্বারা; **অতঃ**—অতএব; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান মানুষ; **আভজেৎ**—সম্যক্‌ভাবে ভজনা করবে; **তম্**—তাঁকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **একয়া**—একাগ্রমনে অনন্য চিন্তায়; **ঈশম্**—শ্রীভগবানের; **গুরু-দেবতা-আত্মা**—গুরুদেবকে আরাধ্য দেবতা এবং প্রিয়তম জ্ঞানে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াবলে আচ্ছন্ন হয়ে যখন জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে জড় জাগতিক দেহটিকে স্বরূপ সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন ভয় জাগে। যখন এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ে বিমুখ হয়, তখন শ্রীভগবানের সেবকরূপে তার স্বরূপসত্ত্বাও বিভ্রান্ত হয়। মায়া নামে অভিহিত বিভ্রান্তির প্রভাবেই এমন বিপর্যয়মূলক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য-দেবতা এবং একান্ত প্রিয়তম জ্ঞানে অনন্য ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, আপত্তি উত্থাপন করা চলতে পারে যে, অজ্ঞতা থেকেই ভয় জাগে, তাই জ্ঞান সঞ্চারের মাধ্যমেই তা দূর করা চলে এবং তার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার প্রয়োজন হয় না। জীব তার জড় জাগতিক দেহ, ঘরসংসার, সমাজ-সম্বন্ধ আর এমনই আরও কত কিছুর সঙ্গে মিথ্যা স্বরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলে, এবং এই মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধিটুকুই তাকে শুধু বর্জন করতে হবে। তা হলে মায়া আর কী করতে পারবে?

এই যুক্তির জবাবে শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ভগবদ্গীতা* (৭/১৪) থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমার শরণাগত হন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" 'জীবতত্ত্ব' নামে শাস্ত্রে অভিহিত প্রত্যেক জীব পরমেশ্বর ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তির অন্যতম, কিন্তু জীবের স্বরূপ-সত্ত্বা হয় তটস্থ, অর্থাৎ পরম শক্তির নিকটস্থ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ হওয়ার ফলেই, প্রত্যেক জীব পরম জীবসত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণের উপর নিত্যকালই নির্ভরশীল

হয়ে আছে। এই সত্যটি বৈদিক শাস্ত্রাদিতে এইভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে—*নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*, অর্থাৎ "সকল নিত্য চেতন সত্ত্বার মাঝে এক পরম নিত্য সত্ত্বা রয়েছেন, যিনি অন্য সকল অগণিত সত্ত্বার সব প্রয়োজন মেটাচ্ছেন।" (*কঠোপনিষদ* ২/১/১২) কৃষ্ণদাস কবিরাজ মন্তব্য করেছেন, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য—"শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বরাট স্বাধীন নিয়ন্তা, অন্য সকল জীব তাঁর উপরেই ভরসা করে থাকে।" (*চৈতন্যচরিতামৃত, আদি*, ৫/১৪২) যেমন আঙুল শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাই শরীরের সেবায় সেটিকে অবশ্যই নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা করতেই হয়, তেমনই আমরাও শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*) শ্রীভগবানের প্রতি অনন্য সেবায় নিত্যকাল নিয়োজিত থাকাটাও আমাদের চিরকালের কর্তব্য (*সনাতন ধর্ম*)।

শ্রীভগবানের যে শক্তি ভগবৎ-সেবায় আমাদের উদ্দীপিত করে থাকে, তাকে বলা হয় *চিৎ-শক্তি*। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জীবসত্ত্বার মধ্যে যখনই স্বাধীনতার প্রবৃত্তি জাগে, তখনই সে জড় জগতে আসতে বাধ্য হয়, যেখানে নানা ধরনের তুচ্ছ এবং অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে সে প্রবেশ করতে থাকে, যার ফলে তার জীবনে এবং ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর ভগবানের *বহিরঙ্গা শক্তি* অর্থাৎ মায়াময় প্রভাব চিৎ-শক্তির সমস্ত লক্ষণাদি আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং জীবসত্ত্বার লালসাচ্ছন্ন হীনপ্রকৃতির ভোগ-উপভোগের অনুকূল একটির পর একটি জড়জাগতিক দেহ তাকে আরোপ করে। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের সাথে যে-জীব তার প্রেমময় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে, তার শাস্তিস্বরূপ যথার্থ নির্ভর যে-পরমেশ্বর ভগবান, তাঁরই নিত্যকালের সচ্চিদানন্দময় রূপটি অনুধাবন করবার উপযোগী সর্বপ্রকার সামর্থ্যও সে হারিয়ে ফেলে। তার পরিবর্তে জীব তার আপন দেহ, তার পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের দেহ, জাতি, শহর আর সেখানকার ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া, এবং নানা ধরনের অগণিত অস্থায়ী জড় জাগতিক দৃশ্যাবলী সম্বলিত অনিত্য প্রবহমান কল্পচিত্রমালার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এমনই সার্বিক অজ্ঞতার পরিবেশে মানুষ যে তার আপন প্রকৃত সত্ত্বায় ফিরে যাবে, তেমন ভাবনা-চিন্তাই তার মনের মধ্যে আর মোটেই আসা-যাওয়া করে না।

শ্রীভগবানের বিধানে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়তই দ্বন্দ্ব চলেছে, সে কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের বিষয়ে *ভাগবতেরও* অনেক জায়গায় *গুণব্যতিক্রম* রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যগুলির

পারস্পরিক সংঘাতের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে জীব যখন-যেমন তখন-তেমন এই ধরনের আপেক্ষিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং মনে করে যে, ভগবান ও ভগবানের আরাধনাও নিতান্তই প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যে আপেক্ষিক, পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। নৃতত্ত্ববাদী, সমাজতত্ত্ববাদী কিংবা মনস্তত্ত্ববাদী চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে, জীব ক্রমশই জড়জাগতিক অজ্ঞতার অন্ধকারে গভীর থেকে গভীরতরভাবে অধঃপতিত হতে থাকে, নিজেকে মূল্যবান দয়াদাক্ষিণ্য, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রগতি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, কিংবা আকাশকুসুম কষ্টকল্পনার ক্ষেত্রে সমর্পণ করে দিয়ে মনে করতে থাকে যে, পরমতত্ত্বের কোনই বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিসত্ত্বা নেই, এই সবই তার কাছে প্রকৃতির গুণাবলীর পারস্পরিক অন্তর্ঘাতমূলক সৃষ্টি বলে প্রতিভাত হয়।

পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তিকে *দুরত্যয়া* বলা হয়; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের একান্ত কৃপা ব্যতীত এই মায়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে, তখন মনুষ্য সৃষ্ট কোনও যন্ত্রপাতি আকাশ থেকে তাদের সরাতে পারে না; কিন্তু যে-সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘগুলি সৃষ্টি হয়েছে, সেই সূর্যই স্বয়ং মেঘের আবরণ মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তেমনই, শ্রীভগবানের মায়াশক্তিতে আমরা যখন আবৃত হয়ে পড়ি, তখন আমাদের অনিত্য অস্থায়ী জড়জাগতিক শরীরটিকে দেহাত্মবুদ্ধি দিয়ে আপন সত্ত্বা বলে মনে করি, আর তাই আমরা সর্বদা আতঙ্ক আর উদ্বেগে কষ্ট পাই। কিন্তু যখন আমরা স্বয়ং শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন তিনি অনতিবিলম্বেই এই মায়া মতিভ্রম থেকে আমাদের মুক্তি দেন। জড়জাগতিক পৃথিবী বাস্তবিকই *পদং পদং যদ্ বিপদাম্*—প্রতিপদক্ষেপেই এখানে বিপদ রয়েছে। যখন জীব উপলব্ধি করে যে, সে এই জড় জাগতিক শরীরটি না, বরং সে শ্রীভগবানের নিত্যদাস বা সেবক, তখনই তার সব ভয় আতঙ্ক দূর হয়ে যায়। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *অত্র ভক্তৈঃ সংসারবন্ধান্ ন ভেতব্যং স হি ভক্তৌ প্রবর্তমানস্য স্বত এবাপয়াতি*—"এই ভাগবত ধর্ম অনুশীলনের মধ্যে জড় জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন সম্পর্কে ভক্তমণ্ডলীর আশঙ্কিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। ভগবদ্ভক্তি সেবায় যিনি আত্মনিয়োগ করেন, তাঁর জীবনে সেই ভয় আপনা হতেই দূর হয়ে যায়।"

এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে, শুধুমাত্র *অহং ব্রহ্মাস্মি* শব্দগুলির দ্বারা নিরাকার নির্বিশেষ আত্ম-উপলব্ধির যে তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়ে থাকে, মায়াশক্তির উৎপন্ন ভয় আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত তার সাহায্যে দূরীভূত হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে*

(১/৫/১২) ব্যাসদেবকে শ্রীনারদ মুনি বলেছেন, *নৈষ্কর্ম্যমপ্য অচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে*—শুধুমাত্র নৈষ্কর্ম্যবাদ অর্থাৎ জড়জাগতিক কাজকর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভ এবং মানব-জীবনের দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার করলেই মানুষকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় না। চিন্ময় স্তরে একটি উত্তম আশ্রয় অবশ্যই জীবকে খুঁজে নিতে হয়; নতুবা জড়জাগতিক অস্তিত্বের ভয়াবহ পরিবেশে তাকে ফিরে আসতে হবে। সেই কথাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

যদি কঠিন পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রাম করে মানুষ ব্রহ্মস্তরে উপনীত হতেও পারে (*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্*), তবু যথাযথ আশ্রয়ের সন্ধান না পেলে তাকে জড় জাগতিক পর্যায়ে আবার ফিরে আসতে হবে। তার মুক্তি বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে, সেটি *বিমুক্তমান*, অর্থাৎ অনুমানভিত্তিক মুক্তি।

প্রকৃতি অনুসারে জীব আনন্দময়—আনন্দের সন্ধান করে। এখন আমরা দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তার কারণ আমরা বৃথাই জড়জাগতিক স্তরে আনন্দের খোঁজ করে চলেছি এবং তার পরিণামে জড় জাগতিক অস্তিত্বের বেদনাদায়ক জটিলতার মধ্যে আমরা জড়িত হয়ে পড়ছি। কিন্তু যদি আমরা আনন্দ সুখভোগের প্রবণতা একেবারেই পরিত্যাগের চেষ্টা করি, তা হলে আমরা তার পরিণামে হতাশাগ্রস্ত হয়ে জড়জাগতিক ভোগলিপ্সার পর্যায়ে ফিরে যাব। যদিও নির্বিশেষ নিরাকার পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ব্রহ্মস্তরের নিত্য অস্তিত্ব রয়েছে, তবে সেই স্তরে কোনও আনন্দ নেই। কারণ আনন্দ উপভোগের স্থূল সূত্র হল আনন্দ। বৈকুণ্ঠধামে যথার্থ চিন্ময় আনন্দ রয়েছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাবোল্লাসমণ্ডিত চিন্ময় রূপ নিয়ে, তাঁর পরমানন্দময় পার্ষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁদের সকলের সচ্চিদানন্দময় বৈশিষ্ট্য সহকারে বিরাজ করছেন। জড় জাগতিক সৃষ্টি নিয়ে তাঁদের কোনই উদ্বেগ নেই। চিন্ময় গ্রহমণ্ডলীতে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী এবং পশুপাখিরাও কৃষ্ণভাবনায় পরিপূর্ণভাবে সচেতন এবং অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম* (গীতা ১৫/৬)। শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময় চিন্ময় গ্রহলোকে কেউ গেলে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে এবং কখনই জড় জাগতিক স্তরে আর ফিরে আসে না। তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *কিং চাত্র ভক্তৈঃ সংসারবন্ধান্ ন ভেতব্যম্।* কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তই ভয় আতঙ্ক থেকে যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এমন সদ্গুরু গ্রহণ করার আবশ্যকতা অপরিহার্য, যিনি *ব্রজেন্দ্রনন্দনপ্রেষ্ঠ*, নন্দ

মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। অন্য কোনও জীবের প্রতি বিদ্বেষমুক্ত হন সদ্‌গুরু, এবং তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা নিবেদনের কথা তিনি অকাতরে বিতরণ করেন। ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবগণ কোনও ক্রমে নম্রভাবে এই বিষয়ে কিছু জ্ঞান আহরণ করলে তারা ভগবানের যে মায়াশক্তি তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং নানা ধরনের দুঃখকষ্টময় জীবযোনির জীবনপর্যায়ে যেভাবে পতিত হচ্ছে, তা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, গুরুকৃপায় নিষ্ঠাবান শিষ্য ক্রমশ লক্ষকোটি লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সসম্ভ্রমে পূজিত ভগবান শ্রীনারায়ণের দিব্য প্রকৃতি তথা স্থিতি ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করতে পারে। শিষ্যের অপ্রাকৃত জ্ঞান যতই ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে, ততই বৈকুণ্ঠপতিরও পরমৈশ্বর্য যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা গোবিন্দের সৌন্দর্যময় জ্যোতির আলোকের কাছে ম্লান হয়ে যায়। বিমোহিত করে আনন্দ প্রদানের অচিন্তনীয় শক্তি শ্রীগোবিন্দের আছে, এবং গুরুদেবের কৃপায় ভক্ত ক্রমান্বয়ে শ্রীগোবিন্দের সাথে তাঁর আপন আনন্দময় সম্পর্ক (রস) সৃষ্টি করে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রুক্মিণী-দ্বারকাধীশ এবং অবশেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময় দিব্যলীলা প্রসঙ্গাদি হৃদয়ঙ্গম করবার পরে, পরিশুদ্ধ জীব প্রত্যক্ষভাবে তার একমাত্র লক্ষ্য তথা আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের অতুলনীয় অধিকার লাভ করে থাকেন।

শ্লোক ৩৮

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা ।
তৎ কর্মসংকল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

অবিদ্যমানঃ—বাস্তবে সত্য নয়; **অপি**—হলেও; **অবভাতি**—প্রকাশিত হয়; **হি**—অবশ্য; **দ্বয়োঃ**—দ্বৈতভাব; **ধ্যাতুঃ**—অভিজ্ঞতা অর্জনকারী পুরুষের; **ধিয়া**—মন ও বুদ্ধির দ্বারা; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **মনোরথৌ**—কিংবা মনস্কামনা; **যথা**—যেমন; **তৎ**—তাই; **কর্ম**—জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ; **সংকল্প-বিকল্পম্**—ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বাসনাদি সৃষ্টির; **মনঃ**—মন; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান পুরুষ; **নিরুন্ধ্যাৎ**—নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; **অভয়ম্**—অভয় লাভ; **ততঃ**—এইভাবে; **স্যাৎ**—হবে।

অনুবাদ

জড়জাগতিক পৃথিবীতে দ্বৈতভাব যদিও শেষ পর্যন্ত থাকে না, তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব তার নিজের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে সেই দ্বৈত সত্ত্বাকেই প্রকৃত সত্য বলে

হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে জড়িয়ে পড়ে বলেই প্রবহমান কল্পচিত্রমালাকেই বাস্তব ঘটনাস্রোত বলে মনে করতে থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *শ্রবণকীর্তনাদি লক্ষণ মাত্রত্বং যত্তো ন ব্যাহন্যেত*—মানুষ যদি বাস্তবিকই গুরুত্ব সহকারে জড় জাগতিক মায়ার দ্বিচারিতা বিনষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্যই তাকে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চলতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত বৈদিক সূত্রটি উল্লেখ করেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*)

বৈদিক শাস্ত্রাদি অনুসারে, কলিযুগের জীবগণ আধ্যাত্মিক তথা পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্রে অতিশয় মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে (*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ*)। তাদের মন সদাসর্বদাই বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, এবং তারা অলস প্রকৃতি সম্পন্ন আর অনেক রকম দুষ্ট প্রকৃতির নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে চলে। *ভাগবতেও* তাদের *নিঃসত্ত্বান্* (অস্থির অধীর এবং অধার্মিক), *দুর্মেধান্*, (মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন), এবং *হ্রসিতায়ুষঃ* (স্বল্পায়ু) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব জড় জাগতিক জীবনের অজ্ঞতা অতিক্রমে একান্ত আগ্রহী মানুষকে অবশ্যই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'—শ্রীভগবানের এই পবিত্র নাম কীর্তন ও শ্রবণের প্রক্রিয়ায় আত্মস্থ হতে হবে, সেই সঙ্গে *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থাবলীর মতো ভগবৎ-প্রদত্ত অপ্রাকৃত শাস্ত্রাদি পাঠ চর্চা এবং শ্রবণ অধ্যয়নে অভিনিবেশ করতেও হবে।

বোঝা উচিত যে, জীব একান্তভাবেই চিন্ময় সত্ত্বা এবং বাস্তবিকই জড় জাগতিক শক্তিগুলির সঙ্গে তার একাত্মতা কখনই সম্ভব নয় (*অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*)। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *তস্মিন্ শুদ্ধেঽপি কল্প্যতে*—জীব যদিও শুদ্ধ প্রকৃতির চিন্ময় আত্মা, তবু তার ধারণা হয় যে, সে বুঝি কোনও জড় জাগতিক সৃষ্টি এবং তাই *দেহাপত্যকলত্রাদি* নামে অভিহিত মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড়জাগতিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে *মানসপ্রত্যক্ষ* শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। *মানসপ্রত্যক্ষ* মানে "যার অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র মনের মধ্যেই হয়ে থাকে।" যথার্থ *প্রত্যক্ষ* বলতে কি বোঝায় তা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) বর্ণনা করা হয়েছে—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

যে জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং সকল তত্ত্ব সম্ভারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গূঢ়তত্ত্ব, স্বয়ং শ্রীভগবান প্রদত্ত সেই জ্ঞান-তত্ত্ব (*রাজগুহ্যম্*) শ্রদ্ধা সহকারে যখন কেউ শ্রবণ করে, তখন সেই নির্মল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংস্পর্শে (*পবিত্রমিদমুত্তমম্*) মানুষ প্রত্যক্ষভাবে আপন নিত্যসত্ত্বা (*প্রত্যক্ষাবগমং*) উপলব্ধি করতে পারে। নিজের নিত্য শাশ্বত চিন্ময় প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমেই, মানুষ সর্বাঙ্গীণ ধর্মপ্রাণতা (*ধর্ম্যং*), আনন্দসুখ (*সুসুখং*) এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অনন্তকাল ভক্তিসেবা নিবেদনের কর্তব্য (*কর্তুমব্যয়ম্*) হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্রুতিমন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন—*বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরঙ্গম্*। অর্থাৎ "যে ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণবায়ু মানুষ জয় করেছে, অশান্ত মন আবার তা সবই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।" এই শ্লোকটির ভাবার্থ উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, *সমবহায় গুরোশ্চরণম্*—যদি কেউ তার গুরুদেবের পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে, তা হলে তার পূর্বার্জিত সমস্ত পারমার্থিক অগ্রগতি ব্যর্থ হয়ে যায়—এটাই বুঝতে হবে। এই কথাটি পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিপূর্বেই *গুরুদেবতাত্মা* শব্দের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রামাণ্য গুরুশিষ্য পরম্পরা সূত্রে কেউ যদি গুরু গ্রহণ না করে, এবং তাঁকে আরাধ্য দেবতার মতো একান্তভাবে শ্রদ্ধা না করে তা হলে জড়জাগতিক জীবনের দ্বৈতভাব অতিক্রম করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপনের ফলেই মানসিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাগে। একাগ্র ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে চঞ্চল মন কৃষ্ণবিমুখ ইন্দ্রিয় উপভোগের তৃষ্ণা দূর করতে পারে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণভাবনার মধ্যে কোনই বৈষম্য, ক্ষুদ্রতা কিংবা উল্লাসময় ভাবমগ্নতার অভাব নেই। ভাষান্তরে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনা কোনও জড়জাগতিক বিষয়বস্তুর মতো অস্থায়ী কিংবা নিত্য দুঃখময় নয়। শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতির ফলেই, বদ্ধজীব তার নিজের বুদ্ধি বলতে যা বোঝে, তারই বিভ্রান্তি এবং বিপথগামিতার ফলে দুঃখ ভোগ করছে। পরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশবিশেষ জীব কৃষ্ণধামের চিন্ময় লীলা থেকে বঞ্চিত হয়ে অধঃপতিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃতির ফলে, তারা পাপময় জীবনধারায় মোহগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা এমন সমস্ত বিপজ্জনক জড়জাগতিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগী হচ্ছে, যেগুলি তাদের নিত্য

ভয় আতঙ্কে পূর্ণ করে রেখেছে। সকল সময়ে কষ্টকল্পনার দ্বৈতাচারে যে মনটি নিত্য মগ্ন হয়ে রয়েছে, সেটিকে অবদমিত রাখতে অভিলাষী হলে, মানুষকে অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে সেবা নিবেদনের জীবনধারা গ্রহণ করতে হবে।"

শ্লোক ৩৯

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্মানি চ যানি লোকে ।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৩৯ ॥

শৃণ্বন্—শুনে; **সুভদ্রাণি**—সর্ব মঙ্গলময়; **রথাঙ্গপাণেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধলীলায় তাঁর হাতে রথচক্র ধারণ করেন; **জন্মানি**—আবির্ভাব সমূহ; **কর্মানি**—ক্রিয়াকলাপ সমূহ; **চ**—এবং; **যানি**—যাহা; **লোকে**—এই গ্রহলোকে; **গীতানি**—গীত হয়ে থাকে; **নামানি**—নামকীর্তন; **তদর্থকানি**—এই সকল আবির্ভাব এবং ক্রিয়াকলাপাদির তাৎপর্য সহকারে; **গায়ন্**—গীত হয়; **বিলজ্জঃ**—অচঞ্চল ভাবে; **বিচরেৎ**—বিচরণ করবেন; **অসঙ্গঃ**—আসক্তিরহিত হয়ে।

অনুবাদ

স্থিতবুদ্ধি নির্ভীক মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন এবং দেশ-জাতি স্বরূপ সমস্ত জড় জাগতিক আসক্তি বর্জন করে রথাঙ্গপাণি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত হয়ে অনাসক্ত এবং অচঞ্চলভাবে সর্বত্র বিচরণ করবেন। পবিত্র কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলময়, কারণ বদ্ধ জীবকুলের মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জগতে তিনি জন্ম-কর্ম ও বিবিধ লীলা বিলাস যেভাবে প্রকটিত করেন, তা সবই নাম কীর্তনের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এইভাবেই সারা পৃথিবীতে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন প্রচার করা হচ্ছে।

তাৎপর্য

যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নাম, রূপ ও লীলা অনন্ত, তাই তার সব কিছুই শ্রবণ অথবা কীর্তন করতে কেউই পারে না। সুতরাং *লোকে* শব্দটি বোঝায় যে, এই বিশেষ পৃথিবী গ্রহটিতে শ্রীভগবানের যে সমস্ত দিব্য নাম সর্বজনপরিচিত, সেইগুলি কীর্তন করাই সকলের কর্তব্য। এই জগতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি পরিচিত। তাঁদের গ্রন্থসম্ভার *রামায়ণ* এবং *ভগবদ্গীতা* সারা পৃথিবীতে মানুষ পঠে এবং আস্বাদন করে থাকে। ঠিক তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও

ক্রমশ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে উঠছেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—*'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'* —"তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই প্রামাণ্য শ্লোকটির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই মহামন্ত্রটিকে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ' সমেত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করা হয়ে থাকে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, কোনও প্রকার জড়জাগতিক চিন্তাভাবনাবর্জিত শ্রীভগবানের পবিত্র নামকীর্তনের এই মহানন্দময় পদ্ধতিকে *সুগমং মার্গম্* অর্থাৎ অতি মনোরম পন্থা রূপে অনুমোদন করা হয়েছে। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ সাধনার পদ্ধতিকে *সুসুখং কর্তুম্*, অর্থাৎ অতি আনন্দময় ক্রিয়াকলাপ বলে বর্ণনা করেছেন, আর শ্রীলোচন দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *'সব অবতার সার-শিরোমণি কেবল আনন্দকন্দ'।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণভজনার পদ্ধতি *কেবল আনন্দকন্দ'* অর্থাৎ কেবলই আনন্দময় অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন যে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঠিক যেভাবে করতেন, সেইভাবেই পৃথিবীর যে কোনও দেশের মানুষও সমবেত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তন, *'ভগবদ্গীতার'* মতো প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী পাঠ, এবং আকণ্ঠ কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদন করতে পারেন। অবশ্য এই ধরনের কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর সতর্ক করে বলেছেন, *'বিষয় ছাড়িয়া'* অর্থাৎ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের মানসিকতা বর্জন করতে হবে। যদি কেউ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রশ্রয় দেয়, তবে সুনিশ্চিতভাবে তাকে জীবনের দেহাত্মবুদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে। মনুষ্য জীবনটাকে যে তার দেহ তত্ত্বের ভাবধারায় চিন্তা করে, তার পক্ষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দিব্যলীলা মাহাত্ম্য সবই নিঃসন্দেহে জড়জাগতিক উপলব্ধির ব্যাখ্যায় প্রতিভাত হবে। তার ফলে, শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ সবই মামুলী জাগতিক কাণ্ড বলে বিবেচনার মাধ্যমে মানুষ মায়াবাদ তথা নিরাকার নির্বিশেষবাদী ভগবৎ-তত্ত্বের ভাবাধীন হয়ে পড়বে, যখন শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শরীরটিকে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি বলে মনে হতে থাকে। সুতরাং, এই শ্লোকের মধ্যে *অসঙ্গঃ* শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোনও রকমের মানসিক জল্পনা কল্পনা না করেই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তন করতে হয়। *ভগবদ্গীতার* মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে নিজেকে একমাত্র পরমপুরুষোত্তম ভগবান রূপে পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপটি

জন্মরহিত শাশ্বত নিত্য (*অজোঽপিসন্নব্যয়াত্মা*), সেইভাবেই তাঁকে স্বীকার করে নিতে হবে।

শ্রীল জীব গোস্বামী গুরুত্বসহকারে বলেছেন, *যানি শাস্ত্র দ্বারা সৎপরম্পরা দ্বারা চ লোকে গীতানি জন্মানি কর্মাণি চ তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ*—যদি কেউ শ্রীভগবানের দিব্যপবিত্র নাম শ্রবণ ও কীর্তনে সাফল্য লাভ করতে চায়, তবে *সৎপরম্পরাক্রমে* অর্থাৎ অপ্রাকৃত পদ্ধতিতে গুরুশিষ্য পরম্পরা অনুসারে যে প্রক্রিয়ার ধারা প্রচলিত রয়েছে, অবশ্যই সেই প্রক্রিয়া তাকে অবলম্বন করতে হবে। আর *সৎপরম্পরা* বলতে প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদিসম্মত হতে হবে। অনভিজ্ঞ নিন্দুকদের মতামত খণ্ডন করে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুগামীরা নির্বোধ কিংবা অন্ধবিশ্বাসী নন। তাঁরা বুদ্ধিমানের মতোই গুরুদেব, সাধুসন্ন্যাসী এবং শাস্ত্রকথা বলতে যে সমস্ত সংশোধনী তথা ভারসাম্য নিয়ামক প্রথা আছে, সেগুলি মেনে চলেন। তার অর্থ এই যে, যথার্থ সদ্‌গুরু অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়, যিনি মহর্ষিগণ এবং দিব্য শাস্ত্রাদির ভাষ্য অনুযায়ী প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছেন। যদি কেউ প্রামাণ্য সদ্‌গুরু গ্রহণ করে, মহান্ আচার্যবর্গের পন্থা তথা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো প্রামাণ্য শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে, তা হলে তারপক্ষে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের অনুষ্ঠান এবং শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণের উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সারা বিশ্বে পরমেশ্বর ভগবান বহু নামে পরিচিত, কতকগুলি নাম স্বদেশীয় স্থানীয় ভাষায় অভিব্যক্ত হয়, তবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচয় বোঝাতে যে কোন নামই ব্যবহার করা হোক, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি যে কোনও জড়া প্রকৃতির প্রভাবের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, তাই তাঁকে যে কোনও পবিত্র নামেই অভিহিত করা যেতে পারে, সেই কথাই এই শ্লোকটির মর্মার্থ, *লোকে* শব্দটির মাধ্যমে তা সূচিত হয়েছে।

বিচরেৎ শব্দটির অর্থ 'বিচরণ করা উচিত' সম্পর্কে ভুল ধারণা করা অনুচিত যে, পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে মানুষ নির্বিচারে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে

পারে কিংবা যা খুশি করে চলতে পারে। তাই বলা হয়েছে *বিচরেদসঙ্গঃ*—কৃষ্ণনাম জপকীর্তন অনুশীলনের সময়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা চলে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে যারা বিমুখ কিংবা যারা পাপময় কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়ে রয়েছে, কঠোরভাবে তাদের সঙ্গ বর্জন করে চলতেই হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার* (*শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য* ২২/৮৭)—অর্থাৎ, বৈষ্ণবজনকে সবাই চেনে, কারণ তিনি সম্পূর্ণভাবে সমস্ত মামুলী জাগতিক সঙ্গ একেবারে বর্জন করেই চলেন। শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে পর্যটনকালে বৈষ্ণব প্রচারক যদি কোনও বিনম্রচিত্ত অভক্ত মানুষের সংসর্গ লাভ করেন—যে ব্যক্তি কৃষ্ণকথা শ্রবণে উৎসুক, আগ্রহী, তবে সেই প্রচারক সব সময়ে সেই ধরনের মানুষকে তাঁর সহৃদয় কৃপা প্রদান করবেন। তবে যারা কৃষ্ণকথা শ্রবণে আগ্রহী নয়, বৈষ্ণবগণ অবশ্যই তাদের সঙ্গ পরিহার করে চলবেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অত্যাশ্চর্য লীলাকথা এবং তাঁর পবিত্র নাম শ্রবণে যারা নিয়োজিত হয় না এবং যারা শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদন করে না, তারা নিতান্তই মামুলী, মায়াময় কার্যকলাপে দিনাতিপাত করে কিংবা মিথ্যা জড়জাগতিক ভাবাপন্ন ত্যাগের আচরণে সময় নষ্ট করে থাকে। কখনও বা বিভ্রান্ত লোকে নীরস নির্বিশেষবাদ অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বে মগ্ন হতে চেষ্টা করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বিস্তার ইত্যাদির বর্ণনা পরিহার করে চলে। কিন্তু যদি মানুষ কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে, তা হলে সে শুষ্ক মনগড়া তর্কবিতর্কের পথ পরিহার করে ভগবদ্ভক্তির যথার্থ বৈদিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, দ্বৈত শব্দটির দ্বারা একটা ভ্রান্ত উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয় যেন কোনও কোনও বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ করছে। অদ্বৈত তত্ত্বের মায়াবাদের কোনও চিন্ময় মর্যাদা নেই, সেটি নিতান্তই মনের মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্বের গ্রহণ তথা স্বীকৃতি এবং বর্জন তথা অস্বীকৃতির মনোভাবকেই প্রকাশ করে থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য স্থিতি এবং অনন্ত লীলা কোনও ভাবেই অদ্বয়জ্ঞান তথা সৃষ্টিকর্তার দ্বৈত সত্তার অতীত যে চিন্ময় অদ্বয়জ্ঞান, তার বিরোধিতা করে না।

শ্লোক ৪০

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪০ ॥

এবং-ব্রতঃ—যখন এইভাবে মানুষ শ্রবণ-কীর্তনাদি ব্রত পালনে উদ্যোগী হয়; **স্ব**—নিজে; **প্রিয়**—প্রিয়; **নাম**—পবিত্র নাম; **কীর্ত্যা**—কীর্তনের মাধ্যমে; **জাত**—এইভাবে জন্মায়; **অনুরাগঃ**—আকর্ষণ; **দ্রুতচিত্তঃ**—মন দ্রবীভূত হয়; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **হসতি**—হাসে; **অথো**—আরও; **রোদিতি**—কাঁদে; **রৌতি**—উন্মত্ত হয়; **গায়তি**—কীর্তন করে; **উন্মাদবৎ**—উন্মাদের মতো; **নৃত্যতি**—নৃত্য সহকারে; **লোকবাহ্যঃ**—লোকনিন্দা ভুলে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলে মানুষ ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন মানুষ ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠে, শ্রীভগবানের নিত্যসেবক রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, এবং ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশেষ নাম ও রূপের চিন্তা অনুশীলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে তার হৃদয় যতই প্রেমের ভাবোল্লাসে বিগলিত হতে থাকে, ততই উন্মাদের মতো উচ্চহাস্য কিংবা রোদন তথা চিৎকার করে শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। কখনও বা ঐভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মতো মানুষ লোকনিন্দায় অবিচল থেকে নৃত্যগীত করতে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই চিন্ময় অবস্থাটিকে *সম্প্রাপ্তপ্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগস্য সংসারধর্মাতীতাং গতিম্*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মানুষের ভক্তি নিবেদনের অভিলাষ যেভাবে প্রেমের ভাবোল্লাসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, সেই সার্থক সিদ্ধি লাভের জীবন ধারা রূপে বর্ণনা করেছেন। সেই সময়ে, মানুষের চিন্ময় কর্তব্যানুষ্ঠানগুলি জড়জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতে থাকে, অর্থাৎ এই জগতের তথাকথিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মাপকাঠিতে তার বিচার করা অসমীচীন হয়ে ওঠে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (*আদি* ৭/৭৮) গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি রয়েছে—

ধৈর্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই যৈছে মদমত্ত ॥

"এইভাবে ভগবানের নাম নিতে নিতে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না এবং আমি উন্মাদের মতো হাসতে লাগলাম, কাঁদতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম

এবং গান গাইতে লাগলাম।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনতিবিলম্বে তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন—কেন তিনি পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ করতে গিয়ে অমন উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব উত্তরে বলেন—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই স্বভাব যে, কোনও মানুষ তা জপ করতে করতে অনতিবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাব তার মধ্যে উদয় হয়।" (*চৈতন্যচরিতামৃত, আদি* ৭/৮৩) এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "শুদ্ধভক্তের শ্রীঅঙ্গে এই লক্ষণগুলি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কৃষ্ণভক্তেরা যখন কীর্তন করে এবং নৃত্য করে, তখন বিদেশীদের এইভাবে আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য-কীর্তন করতে দেখে ভারতবাসীরা পর্যন্ত আশ্চর্য হন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, শুধু অভ্যাসের ফলেই যে এই স্তরে উন্নত হওয়া যায়, তা নয়—বরং যিনি 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করেন, কোনও রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ভগবদ্-বিমুখ সহজিয়া শ্রেণীর মানুষদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, কারণ ঐসব মানুষগুলি অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ অনুকরণ করে এবং বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য অনুশাসনগুলি অবহেলা করতে থাকে, আর পুরুষোত্তম কৃষ্ণ রূপে এই মর্যাদাভিবিক্ত হতে চেষ্টা করে। তার ফলে, ভগবানের সমুন্নত লীলা প্রসঙ্গাদি অবলম্বনে কৌতুকাবহ দৃশ্যের অবতারণা করে। তাদের ভাবোন্মাদনা বলতে ক্রন্দন, কম্পন এবং ভূমিতে পতন দেখে শ্রীধর স্বামীর বর্ণিত *সম্প্রাপ্তপ্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ* বললে যেমন উচ্চপর্যায়ের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের লক্ষণাদি বোঝায়, তেমন কিছু মোটেই নয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য রেখেছেন, "যিনি এই ভাবের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন না।" তেমনই, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করেছেন—

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

"কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো; তার তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষের আনন্দ এক বিন্দুর মতোও নয়।" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ৭/৮৫) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, *গায়ন্ বিলজ্জো*

বিচরেদসঙ্গঃ—যখন মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল প্রকার আসক্তিরহিত হতে পারে, তখন সেই *অসঙ্গ* পর্যায়ে উন্নীত হলে মানুষের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির প্রেমময়ী ভাবোন্মাদনার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

এই শ্লোকের মধ্যে *লোকভয়ঃ* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, যথার্থ ভগবৎ-প্রেমের উচ্চ পর্যায়ে যখন শুদ্ধ ভক্ত উন্নীত হয়, তখন সে আর কোনও রকমের বিদ্রূপ, প্রশংসা, শ্রদ্ধা কিংবা সমালোচনা মাধ্যমে সাধারণ লোকের মতো দেহাত্মবুদ্ধির ধারণায় কষ্ট পায় না। শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং তিনি স্বয়ং যখনই তাঁর আত্মনিবেদিত সেবকের কাছে উদ্ঘাটিত করেন, তখন পরম তত্ত্ব সম্পর্কে সকল প্রকার সন্দেহ এবং কল্পনার চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য *বরাহপুরাণ* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

কেচিদ্ উন্মাদবদ্ভক্তা বাহ্যলিঙ্গপ্রদর্শকাঃ ।
কেচিদান্তরভক্তাঃ স্যুঃকেচিচ্চৈবোভয়াত্মকাঃ ।
মুখপ্রসাদাদ্ দার্ঢ্যাচ্চ ভক্তির্জ্ঞেয়া ন চান্যতঃ ॥

"কিছু ভগবদ্ভক্ত উন্মাদের মতো বাহ্যিক লক্ষণাদি প্রকাশ করেন, অন্যেরা অন্তরে ভক্তিভাব পোষণ করে থাকেন, আবার আরও অনেকে উভয় ধরনের আচরণই ব্যক্ত করেন। ভক্তের মুখনিঃসৃত ভাবপ্রকাশ এবং তাঁর দৃঢ়চিত্ত ভক্তিভাব লক্ষণাদি থেকেই তাঁর ভক্তির স্বরূপ বিচার করা যেতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়।"

ভাবোন্মাদনাময় উচ্চহাস্য এবং ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধির অন্যান্য লক্ষণাদির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—" 'ঐ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ তস্করটি ননী চুরি করবার জন্য বাড়িতে ঢুকেছে। ধর তাকে! তাড়াও তাকে!'—এইভাবে বয়স্কা গোপী জরতীর ভয়ার্ত কথা শুনে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বাড়িটি থেকে বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হলেন। যে ভক্তের কাছে এই দিব্যলীলা প্রসঙ্গটি উদ্ঘাটিত হয়, তিনি ভাবোন্মাদনায় হাস্যরস উপভোগ করতে থাকেন। কিন্তু তার পরেই অকস্মাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর দেখতে পান না। তাই তিনি দারুণ হতাশায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন, "হায়! আমি জগতের সব চেয়ে বিপুল আনন্দসম্পদ পেলাম, আর এখন হঠাৎ সেটি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেল!' তাই ভক্ত উচ্চস্বরে রোদন করতে থাকেন, "হে আমার ঈশ্বর! কোথায় তুমি? আমাকে উত্তর দাও!' শ্রীভগবান উত্তর দেন, "প্রিয়ভক্ত, তোমার উচ্চকণ্ঠের অভিযোগ আমি শুনেছি, আর তাই তো আবার আমি তোমার সামনে এসেছি!' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে আবার দর্শন করতে পেরে, ভক্ত গান করতে

শুরু করেন, 'আজ আমার জীবন সার্থক হল।' তাই দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি উন্মাদের মতো নৃত্য করতে থাকেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও মন্তব্য করেছেন যে, *দ্রুতচিত্তঃ* অর্থাৎ 'বিগলিত হৃদয়' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—শ্রীভগবানকে দর্শনের ঐকান্তিক আকুলতার উত্তাপে হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গোলাপী আপেলের রসে পরিপূর্ণ জম্বু নদীর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আচার্যদেব আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, *নামকীর্তনস্য সর্বোৎকর্ষম্* বর্তমান এবং পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে পরিষ্কারভাবেই *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো* অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম যশ কীর্তন ও শ্রবণের চরম উৎকর্ষতা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই তত্ত্বটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই, অন্য কোনও গতি নেই, অন্য কোনও গতি নেই।" *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের এই (আদি ৭/৭৬) শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আমাদের অনুধাবন করতে পরামর্শ দিয়েছেন—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠামো নটামো নির্বিশামঃ ॥

"বাক্যবাগীশ লোকেরা যা বলে বলুক; তাদের কথায় আমরা কর্ণপাত করি না। কৃষ্ণপ্রেমের মদিরায় মদোন্মত্ত হয়ে আমরা চতুর্দিকে ঘুরে, ছুটে বেড়িয়ে, গড়াগড়ি দিয়ে এবং ভাবোল্লাসে নৃত্য করে এই জীবনের আনন্দ উপভোগ করব।" (*পদ্যাবলী* ৭৩)

শ্লোক ৪১

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্ ।

সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ ৪১ ॥

খম্—আকাশ; বায়ুম্—বাতাস; অগ্নিম্—আগুন; সলিলম্—জল; মহীম্—পৃথিবী; চ—এবং; জ্যোতিংষি—সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী; সত্ত্বানি—সকল জীবসত্তা; দিশঃ—সকল দিকে; দ্রুম-আদীন্—বৃক্ষাদি সকল স্থাবর প্রাণীকুল; সরিৎ—নদীগুলি; সমুদ্রান্—এবং সমুদ্রগুলি; চ—ও; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; শরীরম্—শরীর; যৎ কিম্ চ—যত রকমের; ভূতম্—সৃষ্ট রূপে; প্রণমেৎ—প্রণম্য; অনন্যঃ—শ্রীভগবানের থেকে অভিন্ন কল্পনা।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষগুল্মাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—যা কিছুই ভক্ত দেখতে পান, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমগ্র শরীর প্রকাশকে তাঁর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করাই ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী পুরাণাদি থেকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন—*যৎপশ্যতি তত্তানুরাগাতিশয়েন "জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্" ইত্বৎ হরেঃ শরীরম্।* "যেহেতু ভোগলোলুপ মানুষের মনে অর্থলিপ্সা থাকে, তাই যেখানেই সে যায়, সেখানে অর্থ উপার্জনের সুযোগ খোঁজে। তেমনই, অত্যন্ত কামার্ত মানুষ সর্বত্র নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকে।" ঠিক এইভাবেই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দিব্যরূপ সব কিছুর মধ্যে দর্শন করে থাকে, যেহেতু সব কিছুই শ্রীভগবানের অংশপ্রকাশ। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি যে, লোভাতুর মানুষ সর্বত্রই অর্থ খোঁজে। যদি সে বনের মধ্যে যায়, অমনি সে ভাবতে থাকে—বনভূমিটা কিনে নিয়ে গাছগুলি কাগজ-কলে বিক্রি করে দিলে লাভবান হওয়া যাবে। ঠিক সেইভাবেই, যদি কোন কামপ্রবণ মানুষ ঐ একই বনে ঢোকে, সে তখন সেখানে সর্বত্র খুঁজতে থাকবে সুন্দরী মহিলা পর্যটকদের—যদি তাঁরা সেখানে বেড়াতে এসে থাকেন। আর যদি একজন ভগবদ্ভক্ত সেই একই জঙ্গলে ঢোকেন, তিনি সেখানে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করতে থাকবেন, কারণ তিনি যথার্থই জানেন যে, সমগ্র বনভূমি, এমনকি বনের ওপরে আকাশব্যাপী চন্দ্রাতপ, সবই

শ্রীভগবানের নিকৃষ্টা শক্তির অভিপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ পরম পবিত্র, কারণ তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং যেহেতু যা কিছুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা সবই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীভগবানেরই শরীর থেকে অভিব্যক্ত তথা অভিপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে। তাই এই সবই যখন কোনও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের চোখে পড়ে, তখন তিনি সবকিছু পরম পবিত্র জ্ঞান করতে থাকেন। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকটিতে *প্রণমেৎ* শব্দটি বোঝায় যে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তুকেই অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী তাই বলেছেন যে, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করাই আমাদের সকলের উচিত।

অবশ্য, এই শ্লোকটির মাধ্যমে নিরাকারবাদী তথা নির্বিশেষবাদী দর্শনতত্ত্ব অনুযায়ী সব কিছুই ভগবান, এমন ধারণা সমর্থন করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

সর্বং হরের্বসত্বেন শরীরং তস্য ভণ্যতে ।
অনন্যাধিপতিত্বাচ্ছ তদননামুদীর্যতে ॥
ন চাপ্যভেদো জগতাং বিষ্ণোঃ পূর্ণগুণস্য তু ॥

"যেহেতু সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সবই তাঁর শরীররূপে বিচার্য। তিনিই সব কিছুর মূল সূত্র এবং সবকিছুর প্রভু, এবং তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন বলে মনে করা অনুচিত। তা সত্ত্বেও কেউ যেন নির্বোধের মতো সিদ্ধান্ত না করে যে, জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই—স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর নিজের অতুলনীয় চিন্ময় গুণবৈশিষ্ট্যে সদাসর্বদাই পরিপূর্ণ থাকেন, যে-বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে না।"

এই প্রসঙ্গে প্রায়ই সূর্য এবং সূর্যকিরণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। সূর্যকিরণ শুধুমাত্র সূর্যগোলকটির অংশপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাই সূর্য এবং তার কিরণের মধ্যে কোনই গুণগত পার্থক্য নেই। কিন্তু সূর্যকিরণ যদিও সর্বত্র বিদ্যমান এবং যদিও সবকিছুই সূর্যের শক্তিরই রূপান্তর, তা হলেও সূর্যগোলকটি সূর্যকিরণের উৎস হওয়া সত্ত্বেও বিশাল আকাশে একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করে এবং তার নিজস্ব বিশেষ রূপটিও রয়েছে।

যদি আমরা সূর্যগোলকের আরও অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করি, তবে আমরা সূর্যদেব বিবস্বানকে দেখতে পাব। যদিও আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবী নামে অভিহিত মানুষগুলি যারা তাদের নিজেদের মাথার চুলগুলিও গুণতে পারে নি, তারা সূর্যদেবতাকে একটা পৌরাণিক রূপ বলেই মনে করবে, কিন্তু আধুনিক মানুষদের বুদ্ধিহীন পুরাতত্ত্ব বাস্তবিকই চিন্তা করে থাকে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাপ এবং

কিরণ বিতরণ করছে যে বিপুলায়তন এবং বুদ্ধির অগম্য অবয়বরূপে সূর্য, তা বুঝি কোনও প্রকার বুদ্ধি সমন্বিত পরিচালন ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করে চলতে পারে। সৌরশক্তির রূপান্তরেই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, এবং তাই সর্বব্যাপী সৌরশক্তির আনুষঙ্গিক অভিপ্রকাশের অনন্ত বৈচিত্র্য পৃথিবী ধারণ করে আছে, তা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সুতরাং সৌর ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রশাসক বিবস্বান পুরুষশ্রেষ্ঠ সূর্য গ্রহের মধ্যে রয়েছেন; সূর্য নিজে একটি স্থানে অবস্থান করে থাকলেও সেখান থেকে সূর্যকিরণ সর্বত্র বিস্তারিত হচ্ছে। সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণই শ্যামসুন্দর ভগবান স্বয়ং; তিনি প্রত্যেকের অন্তরের মাঝে অবস্থিত পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন, এবং পরিণামে ব্রহ্মজ্যোতি নামে সর্বব্যাপী চিন্ময় জ্যোতিস্বরূপ তাঁর নিজ শরীরের দ্যুতির মাধ্যমে তাঁর দিব্য শক্তি শেষ পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তারিত করে রেখেছেন। এই ব্রহ্মজ্যোতির প্রভার মধ্যেই সমগ্র জড়জাগতিক সৃষ্টিপ্রকাশ ভাসমান রয়েছে। ঠিক যেমন পৃথিবীবক্ষে সমস্ত জীবনের লক্ষণই সূর্যের সর্বব্যাপী কিরণের প্রতিরূপ, তেমনই সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশও ব্রহ্মজ্যোতির চিন্ময় দ্যুতিরই এক প্রতিরূপ। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তম্ অশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"অশেষ শক্তিসম্পন্ন আদি পুরুষ-প্রধান শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তাঁর দিব্যরূপের প্রভাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাঁর ঐশ্বর্য অপরিমিত, অনন্ত, নিত্যশাশ্বত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা, এবং সেই শক্তির অভিপ্রকাশে অগণিত বিভিন্ন কোটি কোটি গ্রহরাশি বিবিধ ঐশ্বর্য সমন্বিত হয়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভা বিস্তার করছে।" সুতরাং শ্রীভগবানের দিব্য শরীর থেকে সম্যকভাবে যে চিন্ময় জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, তাকেই ব্রহ্মজ্যোতি বলে। সেই চিন্ময় জ্যোতি থেকে বিভিন্ন রূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তাই যা কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তা বলতে গেলে, প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই আপন শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যা কিছুর অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করছি, তা সবই যে শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপ তা উপলব্ধি করে সবকিছুর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোনও মানুষ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন হন, তবে তাঁর সম্পদ-সম্পত্তিও মর্যাদা বহন করে থাকে। কোনও

দেশের রাষ্ট্রপতি দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ, এবং তাঁর সম্পদের প্রতিও তাই প্রত্যেকের শ্রদ্ধাবোধ থাকা অবশ্য উচিত। ঠিক তেমনই, যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তা সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অংশপ্রকাশ এবং সেই অনুসারেই তার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। শ্রীভগবানের শক্তির অংশপ্রকাশ-রূপে যা কিছু রয়েছে, তা যদি আমরা যথাযথ মর্যাদাসহকারে স্বীকার এবং সমীহ শ্রদ্ধা না করি, তা হলে আমরা মায়াবাদী, তথা নিরাকার নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মবাদের ছলনায় বিভ্রান্ত হওয়ার মতো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারি—যে মায়াবাদকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুসারে যথার্থ পারমার্থিক জীবনচর্যার মধ্যে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে বিষম বিষ বলে মনে করা হয়ে থাকে। *মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ* (*চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য* ৬/১৬৯)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরাশির অংশপ্রকাশের মাহাত্ম্য উপলব্ধি না করেই যদি আমরা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি, তা হলে *ভগবদ্গীতায়* পরিবেশিত *বাসুদেবঃ সর্বম্* এবং *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* উক্তিগুলি আমরা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারব না।

এই অধ্যায়টিতে ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তির উপরে নির্ভরশীল নয়, এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে, এমন চিন্তাভাবনা থেকেই ভয়-ভ্রান্তি জাগে। এখন, এই শ্লোকটিতে, এই ভয় ভ্রান্তি জয় করবার সবিশেষ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির অংশপ্রকাশরূপেই আমরা যা কিছু দেখছি তা সব উপলব্ধি করবার মতো মানুষের মনকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে। শ্রীভগবানেরই শরীরের অংশস্বরূপ সব কিছুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাঁকে মনোনিবেশ করতে অভ্যস্ত হলে, মানুষ সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হবে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে, *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকটি জীবেরই সুহৃদ। যে মুহূর্তে মানুষ বুঝতে পারে যে, সমস্তকিছুই তার পরম প্রিয়তম সখার শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, তখনই সে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, যেখানে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কাছে পরমানন্দময় ধাম (*বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*) হয়ে ওঠে, যেহেতু সর্বত্রই সে কৃষ্ণদর্শন করতে থাকে।

যদি শ্রীকৃষ্ণের পরমসত্তা সবকিছুর উৎস না হত, যদি সবকিছু কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত না হত, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিসত্তা যে এক ধরনের নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্বের জড়জাগতিক অভিব্যক্তি, তেমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারত। *বেদান্তসূত্র* গ্রন্থে যেভাবে বলা হয়েছে যে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরমতত্ত্ব থেকেই সব কিছুর জন্ম বা সৃষ্টি হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অহং

সর্বস্য প্রভবঃ—"আমিই সব কিছুর উৎস।" যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের আপন শরীর থেকে কোনও বস্তু বা বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তা হলে আমাদের সন্দেহ জাগতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের পরম ব্যক্তিসত্তা বাস্তবিকই *বেদান্তসূত্র* গ্রন্থে বর্ণিত সবকিছুর পরম উৎস কিনা। যে মুহূর্তে মানুষ এইভাবে ভাবতে থাকে, তখনই তার মনে ভয় জাগে, এবং বুঝতে হবে সে শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলায়িত হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই প্রকাশ, এইভাবে বিশ্বসংসার দর্শন করতে আমরা যদি না পারি, তা হলে আমরা *ফল্গু বৈরাগ্য* তথা অপরিণত প্রকৃতির বৈরাগ্য ধর্মের অধীন হয়ে পড়ব। যা কিছু আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দর্শন করি, তা সবই আমাদের মনকে কৃষ্ণসেবাবিমুখ করে তুলবে। কিন্তু যদি আমরা সব কিছু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দর্শন করি, তা হলে সবকিছুই আমরা কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে উপযোগ করতে উৎসাহী হব। একেই বলে *যুক্ত-বৈরাগ্য।* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত এই যে, "মানুষ আপন স্বরূপ উপলব্ধি করলে বুঝতে পারে যে, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই নানা পরিকররূপে বিরাজ করছে। তাই এইভাবেই বিচ্ছিন্নবাদী মনোবৃত্তি থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করে, নচেৎ সমগ্র পৃথিবীটাকেই সে নিজেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিদ্যমান মনে করতে থাকে। যথার্থ দিব্য স্তরে ভক্ত যা কিছু দর্শন করে, তা সবই কৃষ্ণচিন্তা জাগিয়ে তোলে, এবং তার ফলে তার দিব্যজ্ঞান ও আনন্দ ক্রমবর্ধমান হয়।"

যেহেতু নিরাকারবাদী দার্শনিকেরা সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসংশ্লিষ্ট বলে দেখতে জানে না, তাই তারা এই জগতটিকে অলীক অসত্য (*জগন্মিথ্যা*) বলে ঘোষণা করে। কিন্তু যেহেতু জড় জগৎ পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণেরই অভিপ্রকাশ, তাই বাস্তবিকই তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। জড় জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিতান্তই কষ্টকল্পনা, এবং তেমন কোনও কাল্পনিক চিন্তাধারা নিয়ে কেউ সম্ভবত এই জগতে কোনও কাজই করতে পারে না। সুতরাং, নিরাকারবাদীরা একটা ভ্রান্তিকর তত্ত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে সেই ভাবধারা নিয়ে বাস্তব জগতে বসবাস করতে না পেরে, জড়জাগতিক চিন্তার স্তরেই ফিরে আসে তাদের জনহিতকর তথা স্থূল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে।

যেহেতু নিরাকারবাদী মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আপন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, সেই কারণে কিভাবে কিংবা কার সেবায় এই জগতের সবকিছুর উপযোগ সাধন করতে হয়, তা জানে না, তার ফলে জড়জাগতিক কর্মফলাশ্রিত ক্রিয়াকলাপে

আবার জড়িত হয়ে পড়বার বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হয়। সুতরাং *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্*—তাদের পক্ষে পারমার্থিক লাভ অর্জনের নিরাকারবাদী কাল্পনিক পন্থা অনুসরণ করে চলা নিতান্তই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে এগিয়ে চলার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তকে সাহায্য সহযোগিতা করবার মানসেই এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে সন্নিবিষ্ট পূর্ববর্তী শ্লোকগুলি থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের জীবনধারা আয়ত্ত করাই মানুষের চরম লক্ষ্য। যদি কেউ এই শ্লোকটিকে কাল্পনিক মায়াবাদী দর্শনের সমর্থক রূপে মিথ্যা তাৎপর্য আরোপ করে যে, সবকিছুই ভগবান, তা হলে মানুষ নিতান্তই বিভ্রান্ত হবে এবং পারমার্থিক উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

শ্লোক ৪২

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ৪২ ॥

ভক্তিঃ—ভক্তি; **পর-ঈশ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **অনুভবঃ**—প্রত্যক্ষজ্ঞান; **বিরক্তিঃ**—অনাসক্তি; **অন্যত্র**—সবকিছু থেকে; **চ**—এবং; **এষঃ**—এই; **ত্রিকঃ**—এই তিনটি; **এককালঃ**—একই সাথে; **প্রপদ্যমানস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণার্থে; **যথা**—যেভাবে; **অশ্নতঃ**—আহারে প্রবৃত্ত; **স্যুঃ**—তারা করে; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **পুষ্টিঃ**—পুষ্টিসাধন; **ক্ষুদপায়ঃ**—ক্ষুধা নিবারণ; **অনুঘাসম্**—প্রত্যেক গ্রাসের সাথে।

অনুবাদ

ভোজনকারী মানুষের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি একই সাথে সমাধা হতে থাকে, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত মানুষও ভগবৎ-ভজনার সময়ে একই সঙ্গে প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির স্ফূর্তি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট বিষয়াদি থেকে বিষয় বৈরাগ্যের ভাব উপলব্ধি করতে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই উপমাটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—*ভক্তিভাবের* সঙ্গে *তুষ্টিভাব* তথা সন্তুষ্টির তুলনা করা চলে, কারণ দুটি ভাবের মাধ্যমেই

তৃপ্তিসুখের আধার সৃষ্টি হয়। *পরেশানুভব* (পরমেশ্বরের অনুভব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা) এবং *পুষ্টি* (বৃদ্ধিলাভ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা) দুটিই সমার্থক, কারণ দুটির মাধ্যমেই মানুষের জীবন রক্ষা হয়। অবশেষে, *বিরক্তি* (অনাসক্তি) এবং *ক্ষুদপায়* (ক্ষুধা নিবৃত্তি) উভয়ের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে, উভয় প্রক্রিয়াই মানুষকে আরও আকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত করে যাতে সে *শান্তি* অর্থাৎ বিশ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে।

যে মানুষ আহার করছে, সে শুধু যে অন্য সকল কাজে আগ্রহবোধ করে না, তাই নয়, ক্রমশই খাদ্যের প্রতিও তার আগ্রহ কমতে থাকে, যেহেতু সে তৃপ্তিলাভ করছে। অন্যদিকে, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যে মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় স্বরূপ সত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, তারও কৃষ্ণবিষয় ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে নিরাসক্তি উপলব্ধি হতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। অতএব এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য রূপ এবং গুণবৈচিত্র্য কখনই জড় জাগতিক হতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় আনন্দ সত্তা আস্বাদন করে মানুষ কখনই পূর্ণ তৃপ্তি অর্জন করতে পারে না।

বিরক্তিঃ শব্দটি এই শ্লোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *বিরক্তি* মানে 'অনাসক্তি'। তেমনই *ত্যাগ* মানে 'বর্জন'। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *ত্যাগ* শব্দটি এমন কোনও পরিস্থিতিতে ব্যবহার যোগ্য, যেখানে মানুষ কোনও উপভোগ্য বস্তু বর্জন করতে মনস্থ করেছে। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সবকিছুই যথার্থ উপযোগী মূল্যবান পরিকর রূপে যেভাবে পূর্ববর্তী শ্লোকে বিবেচনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে ত্যাগ কিংবা বর্জনের কোনও চিন্তারই প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবৎ-সেবায় মানুষ সব কিছুই যথাযথভাবে উপযোগ করে থাকে। *যুক্তবৈরাগ্যম্ উচ্যতে।*

সুখাদ্যের অতি মনোরম উপমাটি এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ থালাভর্তি মুখরোচক খাদ্য আহারে ব্যস্ত থাকার সময়ে তার চারিপাশে অন্য কোনও ঘটনায় আগ্রহী হয় না। আসলে, তখন অন্য কোনও বিষয় বা কাজ তার উপাদেয় খাদ্য উপভোগের একাগ্রতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বলে সে মনে করে। তেমনই, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে অগ্রগতির সময়ে মানুষ কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ বহির্ভূত অন্য যে কোনও বিষয়কে বিরক্তিকর বিপত্তি বলেই বিবেচনা করতে থাকে। ভগবৎ-প্রেমের এমন আনন্দঘন বৈচিত্র্যের কথা *ভাগবতে তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্* (ভাগবত ২/৩/১০) শব্দগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। জড় জগতকে বর্জন করবার কৃত্রিম ভাব প্রদর্শন করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য; তার

চেয়ে বরং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ঐশ্বর্য-প্রকাশরূপে সবকিছুই দর্শন করবার মতো মনকে ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলাই মানুষের উচিত। কোনও ক্ষুধার্ত জড়জাগতিক মানুষ দামি দামি খাদ্যসম্ভার দেখেই তৎক্ষণাৎ তা মুখে পুরতে চায়, তেমনই উত্তম কৃষ্ণভক্তও জড় বস্তু দেখেই, অনতিবিলম্বে কৃষ্ণপ্রীতিবিধানে তা উপযোগ করতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণসেবায় প্রতিটি বস্তু উপযোগের স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা বিনা এবং কৃষ্ণপ্রেমের গহন সাগরে গভীর থেকে গভীরতর অবগাহনের উদ্দাম বিহনে, ভগবৎ-উপলব্ধি কিংবা ধর্মীয় জীবন যাপন বলতে যা বোঝায়, তা নিয়ে অসংলগ্ন বাক্যালাপ অবশ্যই ভগবদ্ধামে প্রবেশের যথার্থ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভক্তিযোগের পথ এমনই আনন্দময় এবং বাস্তবসম্মত যে, সাধনভক্তির স্তরেও যখন উন্নত পর্যায়ের উপলব্ধি ব্যতিরেকেই মানুষ বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করে চলে, তখন সার্থকসিদ্ধি করতেও পারে। শ্রীল রূপ গোস্বামী (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১৮৭) তাই বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

যখনই মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে (*প্রপদ্যমানস্য*), সকল প্রকার ভিন্ন কর্তব্যকর্ম বর্জন করে (*বিরক্তিরন্যত চ*), তখনই তাকে মুক্তাত্মা রূপে বিবেচনা করতে হবে (*জীবন্মুক্তঃ*)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, কোনও জীব যখনই উপলব্ধি করে যে, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সকল সত্ত্বার উৎস এবং তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার সকল দায়ভার স্বীকার করেন এবং তাঁর হৃদয়ের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন যাতে শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রয় সে লাভ করতে পারে। তাই ভক্তি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এবং অন্য সকল বস্তু থেকে অনাসক্তি ভক্তিযোগের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই প্রতিভাত হয়ে থাকে, কারণ ভক্তিযোগের সূচনা মুক্তির ক্ষণ থেকেই হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির চরম লক্ষ্যরূপে মুক্তি লাভ আশা করা হয়, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলা হয়েছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

যদি মানুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে অচিরেই তার মুক্তিলাভ হয় এবং সেইভাবে শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রয়াধীনে আস্থা স্থাপন করে দিব্য ভক্তরূপে তার জীবনধারার সূচনা হয়।

শ্লোক ৪৩

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং-
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **অচ্যুত**—অনন্ত অক্ষয় পরমেশ্বর ভগবান; **অঙ্ঘ্রিম্**—চরণ; **ভজতঃ**—ভজনাকারী; **অনুবৃত্ত্যা**—অবিরাম অনুশীলনের মাধ্যমে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **বিরক্তিঃ**—অনাসক্তি; **ভগবৎ-প্রবোধঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান; **ভবন্তি**—প্রকাশিত হয়; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবতস্য**—ভক্তের; **রাজন্**—হে নিমিরাজ; **ততঃ**—তখন; **পরাং শান্তিম্**—পরম শান্তি; **উপৈতি**—লাভ করে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরমেশ্বর অচ্যুত অক্ষয় শ্রীভগবানের চরণকমল যে ভক্ত নিত্য প্রয়াসে আরাধনা করতে থাকে, তার ফলেই তিনি নিরন্তর ভক্তিভাব, অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেন। এইভাবে ভজনশীল ভগবদ্ভক্ত পরম দিব্য শান্তি লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৭১) বলা হয়েছে—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

"যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড়জাগতিক বিষয়াদির প্রতি নিস্পৃহ হয়ে নিরহঙ্কারী এবং মমত্ববোধ রহিত হয়ে জীবন যাপন করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "নিস্পৃহ হওয়া বলতে বোঝায়—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোনও কিছুর কামনা বর্জন করা। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হলেই যথার্থ কামনাশূন্য হওয়া বোঝায়। এই ধরনেরই কথা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্য* ১৯/১৪৯) গ্রন্থে রয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম হন বলেই তিনি শান্ত থাকেন। কিন্তু ভুক্তিকামী কর্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং সিদ্ধিকামী যোগীরা জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বলে অশান্ত।"

সচরাচর স্বার্থ বুদ্ধিসম্পন্ন অভিলাষে আক্রান্ত জীব তিন ধরনের হয়। তারা ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী এবং সিদ্ধিকামী। ভুক্তিকামী মানুষ বলতে তাদের বোঝায়, যারা সাধারণ মানুষদের মতোই অর্থ সম্পদ খোঁজে এবং অর্থের বিনিময়ে যা কিছু পাওয়া যায়, সব পেতে চায়। এই ধরনের আদিম মনোভাব গড়ে ওঠে টাকাকড়ি, নারী সম্ভোগ এবং সামাজিক মর্যাদার মাধ্যমে জীবন উপভোগের বাসনা থেকে। যখন কোনও জীব এই মায়ামোহ পূরণে বিভ্রান্ত হয়, তখন সে কষ্টকল্পনাজাত জীবন দর্শনের পথ অবলম্বন করে এবং মোহগ্রস্ত হওয়ার উৎস সন্ধানে বিচার বিশ্লেষণ করবার পথে নামে। এই ধরনের মানুষকে বলা হয় মুক্তিকামী, কারণ সে জড়জাগতিক মোহভাব নস্যাৎ করতে চায় এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত নির্বিশেষ নিরাকারবাদী চিন্ময় শূন্যতার তত্ত্বকথা অবগাহন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। মুক্তিকামী মানুষ নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও নানাকাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, যদিও সেই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই হয় দারুণ উচ্চাশায় ভরপুর। তেমনই, সিদ্ধিকামী, অর্থাৎ রহস্যময় ধ্যানচর্চায় অভ্যস্ত যোগী দুর্বোধ্য যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে চমকপ্রদ ক্ষমতা অর্জনে অভিলাষী হয়, যেমন—পৃথিবীর অপর প্রান্তে হাত বাড়িয়ে দিতে, কিংবা অণু-পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র হতে অথবা লঘুতম বস্তুর চেয়েও লঘুতর হতে চেয়ে, সেই একই প্রকার জড়জাগতিক তথা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাসনা-চরিতার্থ করবার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

তাই, বলা হয়েছে যে, 'সকলি অশান্ত'। যদি কারও মনে কোনও প্রকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাসনা থাকে, তা জড়জাগতিক, দার্শনিক কিংবা যোগচর্চা বিষয়ক, যাই হোক—তার ফলে সে হবে অশান্ত, অর্থাৎ পরিণামে বিভ্রান্ত, কারণ তখন সে সকল প্রকার ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির মূলে নিজেকেই ব্যাপৃত দেখতে থাকবে।

অন্যদিকে, "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'"—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হলে নিষ্কাম হয়ে ওঠা যায়; নিষ্কাম ভক্তের কোনও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাঁর একমাত্র বাসনা হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধন। দেবাদিদেব শিব স্বয়ং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের এই অতুলনীয় মহান গুণটির প্রশংসা করে বলেছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"যে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন, তিনি কোন কিছুতেই ভীত সন্ত্রস্ত হন না। স্বর্গরাজ্যে উত্তরণ, নরকধামে অধঃপতন, এবং জড়বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ—সবই ভগবদ্ভক্তের কাছে সমান।" (*ভাগবত* ৬/১৭/২৮) নিরাকার নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা যদিও বোঝাতে চায় যে, সবকিছুই এক, তাহলেও ভগবদ্ভক্ত বাস্তবিক ক্ষেত্রে তুল্যার্থদর্শী হয়েই থাকেন, অর্থাৎ তিনি সব কিছুর মধ্যেই একত্ব অনুভবের ভাবদর্শন লাভ করে থাকেন। ভগবদ্ভক্ত প্রত্যেক বস্তুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি প্রকাশ রূপে দর্শন করেন এবং তার ফলেই সব কিছুই শ্রীভগবানের সেবায়, শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনে উপযোগ করতে চান। যেহেতু ভগবদ্ভক্ত কোন বস্তু বা বিষয়কেই শ্রীভগবানের শক্তি প্রকাশের বহির্ভূত 'দ্বিতীয়' সত্ত্বা বলে চিন্তাভাবনা বা দর্শন করেন না, তাই তিনি যে কোনও পরিবেশ-পরিস্থিতির মাঝেই সুখী থাকেন। কৃষ্ণভক্তের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাসনা থাকে না বলে বাস্তবিকই তিনি 'শান্ত' থাকতে পারেন, কারণ জীবনের সার্থক সিদ্ধি বলতে যা বোঝায় সেই কৃষ্ণপ্রেম তিনি অর্জন করতে পেরেছেন। বাস্তবিকই তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আশ্রয় পেয়ে এবং সুরক্ষাধীন হয়ে তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ সত্ত্বায় অবস্থিত হতে পেরেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, নবযোগেন্দ্রগণের মধ্যে প্রথম যোগী শ্রীকবি, "পরম মঙ্গময় কোনটি?"—মহারাজা নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গটি এই শ্লোকটিতে সমাপ্ত হল।

শ্লোক ৪৪

শ্রীরাজোবাচ

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্ ।
যথাচরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **অথ**—অতঃপর; **ভাগবতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত সম্পর্কে; **ব্রূত**—কৃপা করে আমাকে বলুন; **যৎ-ধর্মঃ**—যে সকল ধর্মাচরণ; **যাদৃশঃ**—যে ধরনের; **নৃণাম্**—মানুষের মাঝে; **যথা**—কিভাবে; **আচরতি**—আচরণ করেন; **যৎ**—কি; **ব্রূতে**—বলেন; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণাদি; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—শ্রীভগবানের প্রিয়জন রূপে বিদিত।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সম্পর্কে বিশদভাবে এখন আমাকে কৃপা করে সব বলুন। কিভাবে আমি উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং

কনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি, সেই সকল স্বাভাবিক লক্ষণাদি বিষয়ে আমাকে বলুন। বৈষ্ণবগণের বিশেষ ধরনের ধর্মাচরণাদি কি প্রকার হয় এবং তিনি কিভাবে বাক্যালাপ করে থাকেন? বিশেষত, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে কিভাবে বৈষ্ণবেরা প্রিয়জন হয়ে ওঠেন, সেই লক্ষণাদি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আমাকে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মহামুনি কবি ভগবদ্ভক্তের আকৃতি প্রকৃতি, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ সংক্রান্ত সাধারণ লক্ষণাদি বিষয়ে জ্ঞাতব্যগুলি মহারাজ নিমিকে জানালেন। কিন্তু নিমিরাজ তখন প্রশ্ন করেছেন—কিভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণবদের সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারা যায়, সেই বিষয়ে তাঁকে বিশদভাবে জানাতে হবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতানুসারে, *কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত*—"যে কোনও ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করলে তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা করা উচিত।" (*উপদেশামৃত ৫*) যে কোনও জীব মনোনিবেশ সহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ করতে থাকলে, তাকে বৈষ্ণব বিবেচনা করা উচিত এবং অন্তত মনে মনেও তাকে শ্রদ্ধা জানানো দরকার। তবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পথে বাস্তবিক অগ্রসর হতে হলে অন্ততপক্ষে কোনও একজন মধ্যম ভক্তের সাথেও সঙ্গ করা উচিত। আর যদি কোনও উত্তম ভক্তের কৃপালাভ কেউ করতে পারে, তবে তার পক্ষে সিদ্ধিলাভ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। তাই নিমি মহারাজ বিনীতভাবে জানতে চেয়েছেন, "ভক্তগণের চারিত্রিক লক্ষণাদি, আচার-আচরণ এবং কথাবার্তা কি ধরনের হয়ে থাকে?" রাজা জানতে চেয়েছেন, কায়মনোবাক্যে কোন্ কোন্ বিশেষ লক্ষণাদির দ্বারা বিভিন্ন উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারা যেতে পারে। রাজার অনুসন্ধিৎসার উত্তরে, নবযোগেন্দ্রগণের অন্যতম শ্রীহরি মুনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক তত্ত্ববিজ্ঞানের আরও বিশদ আলোচনা করবেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীহরিরুবাচ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীহরিঃ উবাচ—শ্রীহরি মুনি বললেন; **সর্বভূতেষু**—সকল বিষয় মধ্যে (ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজ তথা বস্তুসামগ্রী, চিন্ময় সত্তা এবং বস্তু ও চিন্ময় সমন্বিত সকল সত্তা);

যঃ—যে কেহ; পশ্যেৎ—দেখে; ভগবৎ-ভাবম্—শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকার সামর্থ্য; আত্মনঃ—পরমাত্মা, অর্থাৎ জীবনের জড়জাগতিক ধারণার অতীত চিন্ময় সত্ত্বা; ভূতানি—সকল জীব; ভগবতি—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মাঝে; আত্মনি—সকল অস্তিত্বের মূল সত্ত্বা; এষঃ—এই; ভাগবত-উত্তমঃ—ভগবদ্ভক্তিমার্গে উত্তমরূপে প্রাগ্রসর।

অনুবাদ

শ্রীহবি মুনি বললেন—অতি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই সকল আত্মার পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান দর্শন করতে পারেন। তার ফলে, তিনি সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কযুক্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, যা কিছু বর্তমান, সবই শ্রীভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৩০) শ্রীভগবান বলেছেন,

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

"যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃসন্দেহে সর্বত্র শ্রীভগবানকে দর্শন করেন এবং সব কিছুই শ্রীভগবানের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে, তা দর্শন করতে থাকেন। যদিও মনে হতে পারে যে, এই ধরনের মানুষ বুঝি মায়ার ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রকাশকেই সাধারণ মানুষের মতো ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরই প্রকাশ, তাই তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর ঈশ্বর—এটাই কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক মূল তত্ত্ব।"

সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের যোগ্যতা সম্পর্কে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরম্ অচিন্ত্যগুণ স্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত নয়নে ভক্তগণ যাঁকে সদাসর্বদা অন্তর মধ্যে দর্শন করে থাকেন, যিনি অচিন্ত্য গুণরাজির স্বরূপ সত্ত্বা নিয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরের নিত্য রূপে ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আমি সেই আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দেরই ভজনা করি।" চিন্ময় গুণরাজির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত কোনও ভগবদ্ভক্ত তাঁর চিন্ময় দর্শন শক্তির পরিব্যাপ্তির ফলে মহিমান্বিত হয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাদৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহাভাগবত অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত বলেই স্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান রয়েছেন। দৈত্যস্বরূপ পিতা তখন জানতে চেয়েছিলেন—প্রাসাদের থামের মধ্যেও শ্রীভগবান আছেন কিনা। যখন প্রহ্লাদ হ্যাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু যথার্থ দৈত্যদানবের মতোই থামটি তরবারি আঘাতে ভেঙে ফেলেছিলেন যাতে শ্রীভগবানকে বধ করা যায়, কিংবা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়। তখন পরমেশ্বর ভগবানের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে শ্রীনৃসিংহদেব অচিরেই আবির্ভূত হন এবং হিরণ্যকশিপুর পাপকর্মাদি সমূলে বিনাশ করেন। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে উত্তম অধিকারী ভক্ত রূপে স্বীকার করা যেতে পারে।

শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন কোনও কিছুর ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই তিনি অনুপযুক্ত বলে মনে করেন না, কারণ সবকিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই বহিরঙ্গাশক্তির বিভিন্ন অংশপ্রকাশ রূপে তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন। এই ধরনের ভক্তের জীবন ধারণের উদ্দেশ্যই হল পরমেশ্বর ভগবানকে যেভাবেই হোক প্রসন্ন করতে হবে। তাই প্রতিমুহূর্তে শুদ্ধভক্ত যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা সবই শ্রীভগবানের চিন্ময় চেতনার তৃপ্তি সাধনের প্রেমময়ী বাসনার পরমোৎসাহ ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

যে বদ্ধ জীব তার মনটিকে শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন জড়জাগতিক শক্তির প্রকাশ মাঝে নিমগ্ন রাখে, তাকে জড়জাগতিক প্রকৃতির তিনটি গুণবৈশিষ্ট্য পীড়ন করতে থাকে। এই ভিন্ন প্রকৃতির উদ্দেশ্যই জীবকে সত্যস্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে রাখা। সেই সত্যস্বরূপ বলতে বোঝায় যে, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণও সবকিছুর মধ্যে রয়েছেন। স্থূল প্রকৃতির অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলে, বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবাত্মা বিশ্বাস করতে থাকে যে, তার নিজের সীমাবদ্ধ দর্শন পরিধির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, শুধুমাত্র সেইগুলিই বুঝি বাস্তবিক অস্তিত্বসম্পন্ন বিষয়বস্তু। এই ধরনের মূর্খ লোকেরা অনেক সময়ে চিন্তা করতে থাকে যে, বনের মধ্যে একটা গাছ পড়ে গেলে কেউ শুনতে পায় না, অতএব কোনও শব্দই হয়

না। বদ্ধ জীবগণ মনে করতে পারে না যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেহেতু সর্বত্র বিরাজমান, তাই কেউ শুনতে পাবে না কথাটার অর্থ হয় না; শ্রীভগবান সর্বদাই শুনছেন। *ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩/১৪) তাই বলা হয়েছে, *সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে*—পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সবকিছু শুনছেন। তিনি উপদ্রষ্টা, অর্থাৎ সবকিছুর সাক্ষী হয়ে থাকেন। (*গীতা* ১৩/২৩)

এই শ্লোকটিতে *ভাগবতোত্তমঃ* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, "সর্বোত্তম ভগবদ্ভক্ত" বলতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা একেবারেই জড়বাদী নয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভক্তও নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য যথার্থ নির্ণয় করতে যারা পারে না এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তদেরও কখনই শ্রদ্ধা করে না, তাদের কনিষ্ঠ-অধিকারী বলে জানতে হবে, কারণ তারা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই ধরনের কনিষ্ঠ অধিকারীরা বিশেষত মন্দিরে শ্রীভগবানের পূজা অর্চনা করে থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের গ্রাহ্য করে না। এই জন্যই তারা *পদ্মপুরাণে* দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবের উক্তির অপব্যাখ্যা করে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাদ্ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

"হে দেবী, শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ উপাসনা। তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ তদীয় উপাসনা অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধীয় সব কিছুর উপাসনা।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "শ্রীবিষ্ণু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।" তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ সেবকরূপে শ্রীগুরুদেব, এবং শ্রীবিষ্ণুর সকল ভক্তগণই *তদীয়* অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত তথা দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, গুরু, বৈষ্ণব, এবং তাঁদের ব্যবহৃত সবকিছুই 'তদীয়' এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা সকলেরই আরাধ্য।" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১২/৩৮ তাৎপর্য)

বৈশিষ্ট্য এই যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত তার সর্বপ্রকার জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্যাদিকেও উন্নত পর্যায়ের ভক্তি নিবেদনের লক্ষণাদি মনে করে, সেই প্রমাদবশত সেইগুলির উপযোগ মাধ্যমেই শ্রীভগবানের সেবা নিবেদনে আগ্রহবোধ করে। তবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকতে থাকতে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য প্রচারের কাজে নিয়োজিত ভক্তবৃন্দের সেবারত থাকার মাধ্যমে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তও অধিকতর অগ্রণী বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তার কার্যকলাপগুলি নিবেদনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত হতেও থাকে। যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের মনেও অন্ততপক্ষে এইটুকু বিশ্বাস থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সেই কারণে তেমন প্রত্যেক কনিষ্ঠ অধিকারী

ভক্তই তাদের সঙ্গ দানের মাধ্যমে সাধারণ জীবকুলকেও কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সহযোগিতা করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বের প্রতি কনিষ্ঠভক্ত সমাজের এই ধরনের বিশ্বাস থাকার ফলে, তারা ক্রমশ ভগবদ্ বিরোধী মানুষদের প্রতি ক্রমশই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠতে থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে থাকে, তাদের প্রতি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণ এইভাবে ক্রমশ বিদ্বেষী হয়ে উঠতে উঠতে ক্রমশ শ্রীভগবানের অন্যান্য বিশ্বস্ত সেবকমণ্ডলীর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আকৃষ্ট হতে থাকে এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত মধ্যম অধিকারী নামে অভিহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্তগোষ্ঠীর অভিমুখে অগ্রসর হয়।

মধ্যম পর্যায়ে বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে সর্বকারণের প্রধান কারণরূপে দর্শন করতে থাকে এবং প্রত্যেকের মাঝে যে প্রেম ভালবাসার দিব্য অভিব্যক্তি রয়েছে, তার প্রধান লক্ষ্যরূপে শ্রীভগবানকে চিহ্নিত করতে শেখে। তখন সে এই বিষাদগ্রস্ত ব্যাধি জর্জরিত জগতের মধ্যে বৈষ্ণবদেরই একমাত্র সুহৃদরূপে পরিগণিত করে এবং বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয়ে সমস্ত নিরীহ মানুষদের আকৃষ্ট করতে উৎসাহী হয়। তা ছাড়া, মধ্যম অধিকারী ভক্ত সুদৃঢ়ভাবে ভগবদ্বিদ্বেষীরূপে স্বঘোষিত সকলের সঙ্গে কঠোরভাবে সঙ্গ বর্জন করে চলতে থাকে।

যখন এই ধরনের মধ্যবর্তী গুণ-বৈশিষ্ট্য পরিণতি লাভ করে, তখন পরম গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধ্যানধারণা উদ্ভাসিত হতে শুরু করে, তার অর্থ এই যে, মানুষ উত্তম অধিকারীর পর্যায়ে উপনীত হয়।

কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু, যিনি কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি সম্পন্ন কার্যেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, বিশেষত অন্যান্য বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁরা ভগবানের বাণী প্রচার করে থাকেন তাঁদের মর্যাদা প্রদান করেন না, তেমন কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু সেই শ্রেণীর মানুষদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবেন, যারা শুষ্ক জ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়ে থাকে। যখন মানুষ পার্থিব দয়াদাক্ষিণ্যের আচরণ অভ্যাস করতে থাকে, তখন সে পরমোৎসাহে ধারাবাহিক গতানুগতিক কাজে আত্মনিয়োগ করে চলে এবং মহত্ত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে তার সকল কাজের ফল লাভের থেকে নিজেকে নিস্পৃহ রাখবার প্রয়াস করতে থাকে। ঐ ধরনের গতানুগতিক নিরাসক্তিমূলক কাজের মাধ্যমে, জ্ঞান অথবা পাণ্ডিত্য ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। জ্ঞান অথবা পাণ্ডিত্য যতই প্রকট হতে থাকে, ততই ধর্মপ্রাণ বস্তুবাদী মানুষ জনসেবামূলক এবং দাতব্য কাজে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং বাসনা তৃপ্তিকর পাপকর্মাদি পরিহার করে। যদি সে ভাগ্যবান হয়, তা হলে তখন সে শ্রীভগবানের দিব্য

প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবাকার্যের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে থাকে। ভক্তিমূলক সেবাকার্যের নিছক তত্ত্বমূলক উপলব্ধির অভিলাষে, ঐ ধরনের ধর্মপ্রাণ কোনও জড়বস্তুবাদী মানুষ হয়ত কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের শরণাশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক হতেও পারে।

এইভাবে যদি মানুষ মধ্যম অধিকারী ভক্তের যোগ্যতা অর্জনের অভিমুখে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, সে তখন কৃষ্ণভাবনা প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত কোনও বৈষ্ণবের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। আর মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভক্তি অনুশীলনের কার্যক্রমে যখন সম্যক্‌ভাবে পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়, তখন সে মহা-ভাগবত পর্যায়ে আকৃষ্ট হয় এবং তার হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-অনুগ্রহের মাধ্যমে মহাভাগবত গুরুদেবের সমুন্নত মর্যাদা স্বল্পমাত্রায় অনুভবের করুণা বর্ষিত হয়ে থাকে।

যদি কেউ ভগবদ্ভক্তি সেবার পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তবে সে পরমহংস মহাভাগবত রূপে ক্রমশ প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই পর্যায়টিতে তার সকল কাজকর্ম, চলাফেরা এবং প্রচারকার্যের কর্মব্যস্ততা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই একমাত্র তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তকে মায়াময় কোনও শক্তি অবহেলা কিংবা আচ্ছন্ন করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃতে (৫) জীবনের এই পর্যায়টিকে *ভজনবিজ্ঞম্ অনন্যম্ অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদম্*—নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রকৃত উন্নত শুদ্ধভক্ত, যার হৃদয় অন্যের নিন্দাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীযোগেশ্বর কর্তৃক শক্তিপ্রদত্ত মহাভাগবত তাঁর চরণাঙ্ক অনুসরণকারী যে মধ্যম অধিকারী, তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সাফল্য অর্জনের অনুকূল অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন হওয়ার ফলে সহায়তা প্রদান করেন এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ক্রমান্বয়ে মধ্যম পর্যায়ে উন্নীত করে থাকেন। শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় মাঝে বিরাজমান কৃপাসিন্ধু হতে স্বতঃউৎসারিত সেই প্রেমভক্তি আপনা হতেই প্রবহমান থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবদ্-বিদ্বেষী শত্রুভাবাপন্ন মানুষদের প্রতি কোনও প্রকার শাস্তি প্রদানের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও কোনও মহাভাগবত পোষণ করেন না। বরং, যে সমস্ত শত্রুভাবাপন্ন জীবাত্মা বৃথাই এই জড় জগতটিকে শ্রীকৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের বিষময় মনোবৃত্তি পরিশোধনের উদ্দেশ্যে মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তমণ্ডলীকে তিনি ভগবদ্-বাণী প্রচারের কার্যক্রমে নিয়োজিত রাখেন।

অনেক দুর্ভাগা জীব আছে যারা ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণের মহিমা উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারা মধ্যবর্তী পর্যায়ে ভক্তিসেবা অনুশীলনের উন্নত

অভ্যাসের প্রশংসা করে না এবং উত্তম অধিকারী ভক্তের অতি উচ্চপর্যায়ের মর্যাদাও উপলব্ধির সূচনা করতে পারে না। ঐ ধরনের দুর্ভাগা জীবগণ নিরাকার নির্বিশেষবাদী কষ্টকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, বিশ্বস্তভাবে কংস, অঘ, বক এবং পূতনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে এবং তার ফলে শ্রীহরির দ্বারা নিহত হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগী সমাজ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমল সেবায় অনীহা বোধ করতে থাকে, এবং আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বলতে যা বোঝায়, সেই ধরনের নিজ নিজ বিকৃত মনোদর্শন অনুসারে প্রত্যেক বস্তুবাদী মানুষ বিভিন্ন ধরনের জড়জাগতিক শরীর নিয়ে জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবর্তের প্রক্রিয়ার মাঝে তার নিজেরই দুর্ভাগ্য নির্ণয় করে থাকে। ৮৪ লক্ষ ধরনের জড় জাগতিক বস্তুবাদী রূপের প্রজন্ম সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং বস্তুবাদে বিশ্বাসী জীবগণ বিশেষ ধরনের রুচিসঙ্গত জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুই তাদের জড়জাগতিক প্রগতির প্রতি মায়ামোহবশে নিজেদের জীবনে সেইগুলি বেছে নিয়ে থাকে।

উপমাস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কামার্ত মানুষ যৌন আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত অস্থির হয়ে সারা জগতটাই ভোগাকাঙ্ক্ষা নারীতে পরিপূর্ণ দেখতে পায়। ঠিক সেইভাবেই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সর্বত্রই কৃষ্ণভাবনা লক্ষ্য করতে থাকে, যদি ক্ষণকালের মতো তা আবৃত হয়ে থাকতেও পারে। তেমনই মানুষ নিজেকে যেমন মনে করে, জগতটাকেও তেমনভাবে দেখে (*আত্মবৎ মন্যতে জগৎ*)। এই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, মহাভাগবত সম্পর্কিত ভাবদর্শনটিও ভ্রান্ত, যেহেতু *ভাগবত* গ্রন্থে সর্বত্র ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, জড়জাগতিক প্রকৃতির তিনটি গুণাবলীতে যারা আক্রান্ত, তারা মোটেই কৃষ্ণভাবনাময় নয়, বরং বাস্তবিকই তারা কৃষ্ণবিরোধী হয়। তবে বদ্ধ জীব ভগবদ্-বিরোধী মনে হলেও, নিত্য শাশ্বত অবিসংবাদিত তত্ত্ব হল এই যে, প্রত্যেক জীবই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র। যদিও এখনই কারও অন্তরে দিব্য কৃষ্ণপ্রেমোল্লাস মায়ার প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে, তা হলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে বদ্ধ জীবাত্মা ক্রমশই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার স্তরে উন্নীত হতে থাকবে।

বাস্তবিকই, প্রত্যেকেই কৃষ্ণবিরহের যাতনায় কষ্টভোগ করছে। যেহেতু বদ্ধ জীব মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার কোনও প্রকার নিত্য সম্বন্ধ নেই, তাই সে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয় যে, তার সকল দুঃখদুর্দশাই এই বিরহের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই মায়া, অর্থাৎ 'যে ভ্রমাত্মক ধারণার বাস্তবিকই কোনও অস্তিত্ব নেই'। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণবিরহ ছাড়া অন্য কোনও কিছু থেকে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হয়, এমন চিন্তাই মায়া। তাই যখন কোনও শুদ্ধ ভক্ত এই জগতের মাঝে কোনও

জীবকে কষ্ট পেতে দেখে, তখন সে যথার্থই বুঝতে পারে যে, সে নিজে যেমন কৃষ্ণবিরহে দুঃখভোগ করছে, অন্য সমস্ত প্রাণীও কৃষ্ণবিরহে দুঃখকষ্ট পাচ্ছে। পার্থক্য এই যে, শুদ্ধভক্ত যথাযথভাবে তার হৃদ্‌যন্ত্রণার কারণ নির্ণয় করতে পারে, তবে বদ্ধ জীব মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার নিত্যকালের সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারে না এবং সেই সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিষয়ে অবহেলা থেকে উদ্ভূত অশেষ যন্ত্রণার কারণও বোঝে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলির মাধ্যমে ভগবানের শ্রেষ্ঠভক্তগণের পরমানন্দময় উল্লাস অভিব্যক্ত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৫/৯) ব্রজরাণী এইভাবে বলেছেন—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥

"বনের লতাগুল্মাদি এবং বৃক্ষগুলি শাখাপ্রশাখা সমেত ফুলে ফলে বিপুলভাবে পরিপূর্ণ হয়ে অবনত থেকে যেন তাদের অন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠানের তত্ত্বই অভিব্যক্ত করছে। তাদের অঙ্গে অঙ্গে প্রেমোল্লাসের অভিব্যক্তি প্রকাশের ফলে, তারা মধুক্ষরণ করছে।" অন্যত্র দশম স্কন্ধে (*ভাগবত* ১০/২১/১৫) বলা হয়েছে—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতম্
আবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারেঃ
গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥

"যখন নদীগুলি শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের মনে কৃষ্ণবাঞ্ছা সৃষ্টি হয়, এবং সেই কারণে তাদের তরঙ্গবেগও ভগ্ন হয়ে যায়, আর উচ্ছল জলের আবর্ত লক্ষ্য করা যায়। তখন তরঙ্গরাজির আলিঙ্গনে শ্রীমুরারির পাদপদ্ম তারা ধারণ করতে থাকে এবং কমলপুষ্প উপহার নিবেদন করে।" দশম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে (*ভাগবত* ১০/৯০/১৫) দ্বারকার মহিষীগণ প্রার্থনা করেছেন—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥

"হে কুররীপক্ষী, তুমি বিলাপ করছ। এখন রাত্রিকাল, এবং এই জগতের অন্য কোথাও পরমেশ্বর ভগবান গোপনে নিদ্রা উপভোগ করছেন। কিন্তু হে সখী, তুমি

নিদ্রাশূন্য হয়ে কেন জাগ্রত রয়েছ? তাই, তুমিও কি কমলনয়ন সহসা শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় দৃষ্টিপাতে আমাদেরই মতো চিত্তবিদ্ধ হয়েছ?"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও যশোদা মাতাকে একজন উত্তম অধিকারী ভক্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যেহেতু যশোদা মাতা বাস্তবিকই শ্রীভগবানের বৃন্দাবনলীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে সকল জীবের অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্য রচনার মধ্যে আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, *অত্র পশ্যেদিতি তথা দর্শনযোগ্যতৈব বিবক্ষিতা/ ন তু তথা দর্শনস্য সার্বকালিকতা।* "এই শ্লোকটিতে *পশ্যেৎ* শব্দটি 'অবশ্যই লক্ষ্য করবে' বলতে এমন বোঝায় না যে, প্রতি মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণরূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে; বরং এর অর্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।" যদি শুধুমাত্র যাঁরা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, তাঁদেরই উত্তম ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়, তা হলে শ্রীনারদমুনি, শ্রীব্যাসদেব এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও শ্রেষ্ঠতম ভক্ত রূপে পরিগণিত হতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা সর্বত্র সর্বদা শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন না। অবশ্যই, শ্রীনারদমুনি, শ্রীল ব্যাসদেব ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বোত্তম পর্যায়ে অবস্থিত বলেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে, এবং তাই *তদ্দৃক্ষাধিক্য,* অর্থাৎ শ্রীভগবানকে দর্শনের বিপুল আগ্রহাকুল হয়ে ওঠার যোগ্য বলা চলে। সুতরাং *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণদর্শন করতে থাকেন (যো মাং পশ্যতি সর্বত্র), তার মর্মার্থ এইভাবে উপমার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, কামার্ত মানুষ মনে করতে থাকে, সমগ্র পৃথিবী সুন্দরী নারীতে পরিপূর্ণ।

ঠিক তেমনই, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁরই শক্তিপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই, এমন ভাবধারা মানুষ আয়ত্ত করতেই পারে। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি।* ১৯৬৯ সালে আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এফ্. স্টাল মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের পত্রালাপের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ দাবি করেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী যাঁরা নিষ্ঠাভরে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুনিবিড় কার্যক্রম অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁরা বাস্তবিকই *সুদুর্লভ মহাত্মা* স্বরূপ, কারণ তাঁরা *বাসুদেব সর্বম্* দর্শন করে থাকেন।

পক্ষান্তরে বলতে হয়, মানুষ যদি নিত্যনিয়ত শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করবার একান্ত অভিলাষ নিয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে থাকে, এবং একদিন তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যও অর্জন করে, তা হলে উপলব্ধি করতেই হবে যে, সেই মানুষের জীবনে কৃষ্ণবিনা অন্য কিছুই আর বিদ্যমান নেই।

অবশ্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে অথবা পুঁথিগত বিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, এইকথা জানলেই কেউ উত্তম অধিকারী ভক্ত হয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। বাস্তবিকই কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত করা চাই। অতএব বস্তুতপক্ষে বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন চর্চার কার্যক্রম যিনি পরমাগ্রহে স্বীকার করেছেন এবং আন্তরিকভাবেই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রচারমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তিনি বাস্তবিকই মধ্যম অধিকারী ভক্তের পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। যখনই এই ধরনের কোনও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষে মগ্ন হয়ে ওঠেন এবং শ্রীভগবানের সঙ্গলাভে আকুলতা বোধ করতে থাকেন, যার ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনও কিছুর প্রতি তাঁর আর কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন না, তখনই তাঁকে এই শ্লোকে উল্লিখিত *উত্তম অধিকারী* বৈষ্ণব ভক্ত রূপে স্বীকার করা উচিত।

শ্লোক ৪৬

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরে—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি; **তদধীনেষু**—কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার জন্য যাঁরা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন; **বালিশেষু**—অর্বাচীন তথা অজ্ঞজনদের প্রতি; **দ্বিষৎসু**—শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদের প্রতি বিদ্বেষী জনদের; **চ**—এবং; **প্রেম**—প্রেম-ভালবাসা; **মৈত্রী**—সখ্যতা; **কৃপা**—দয়াদাক্ষিণ্য; **উপেক্ষা**—অবহেলা; **যঃ**—যে কেউ; **করোতি**—করে; **সঃ**—সে, **মধ্যমঃ**—মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত।

অনুবাদ

যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে থাকেন, সকল ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৈত্রিভাবাপন্ন হন, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিদ্বেষী সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা অনুসারে, জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক জীবকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। *মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ* (*গীতা* ১৫/৭)। কিন্তু মায়ার প্রভাবে গর্বোদ্ধত বদ্ধ জীবাত্মা ভগবৎ-সেবা এবং ভগবদ্ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে

ওঠে, জড়বাদী ইন্দ্রিয়তৃপ্তিভোগীদের মধ্যে থেকে নিজেদের নেতা মনোনয়ন করে, এবং ঐভাবে প্রতারক ও প্রতারিত মানুষদেরই এক ব্যর্থ সমাজে কর্মব্যস্ত হয়ে আত্মনিয়োজিত হয়, যে-সমাজে অন্ধজনেরাই অন্ধজনকে গহ্বরের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে চলে। বৈষ্ণবগণেরা যদিও সমাজের সকল বদ্ধ জীবকে তাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আন্তরিকভাবে আগ্রহবোধ করে থাকেন, তবু মায়ার প্রভাবে জড়বাদী মানুষ কঠোর মনে ভগবদ্ভক্তদের সেই কৃপা অভিলাষ বর্জন করে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, যদিও মধ্যম অধিকারী ভক্ত নির্দোষ বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবৎকথা প্রচার করে আগ্রহবোধ করে থাকে, তবু তার পক্ষে নিরীশ্বরবাদী মানুষদের উপেক্ষা করাই উচিত, যাতে তাদের সঙ্গদোষে শুদ্ধ ভক্ত বিরক্ত বা দূষিত হয়ে না পড়ে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদের প্রতি বৈষ্ণবগণের নিস্পৃহ থাকাই উচিত। বাস্তবক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, যখনই ঐ ধরনের মানুষদের কাছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা জ্ঞাপন করা হয়, তখনই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়, যাতে তাদের বিষময় পরিস্থিতি আরও অবনতির পথে নেমে যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধ (১০/২০/৩৬) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্ ।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥

"শরৎকালে কখনও পর্বতশৃঙ্গ থেকে নির্মল জলধারা নেমে আসে, এবং কখনও সেই জলধারা বন্ধ হয়ে যায়। তেমনই, মহাজ্ঞানী মানুষেরাও কোনও কোনও সময়ে পরিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করেন, এবং কখনও বা তাঁরা নীরব হয়েই থাকেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যদিও উত্তম ভগবদ্ভক্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষদের প্রতি আপাত ঘৃণাভাব প্রদর্শন করে থাকেন যেহেতু ঐ ধরনের অসুর প্রকৃতির মানুষেরা ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গে অভিনিবেশের যোগ্য নয়, তবে মধ্যম অধিকারী ভক্তগণের অবশ্যই ঐ ধরনের মনোভাব পরিহার করা উচিত। তা ছাড়া, মধ্যম শ্রেণীর ভক্তের পক্ষে কোনও ক্রমেই প্রচণ্ড নিরীশ্বরবাদী মানুষদের সঙ্গ করা অনুচিত, কারণ ঐ ধরনের সঙ্গদোষে তার মন বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যদি কোনও বৈষ্ণব প্রচারক কোনও বিদ্বেষী মানুষের সম্মুখীন হন, তা হলে ঐ ধরনের বিদ্বেষীদের কাছ থেকে তাঁর

বহু দূরে থাকা উচিত। কিন্তু বিদ্বেষভাবাপন্ন শ্রেণীর মানুষদের রক্ষা করার উপায়াদি উদ্ভাবনের জন্য মনোনিবেশ করতে পারেন। ঐ ধরনের মনোনিবেশ প্রচেষ্টাকে *সদাচার* অর্থাৎ সাধু প্রচেষ্টা বলা হয়ে থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী সাধু ব্যক্তি বলতে প্রহ্লাদ মহারাজের উল্লেখ করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৩) প্রহ্লাদের নিম্নরূপ বিবৃতি রয়েছে—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাঃ
তদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

"হে সর্বোত্তম, আপনার গুণগান এবং কার্যকলাপের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা জড় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে এবং তাদের পরিবারবর্গ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে।" যদিও বৈষ্ণব প্রচারক সদাসর্বদাই সকল জীবের কল্যাণার্থে নিয়ত চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন, তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী গ্রহণে যারা বিমুখ হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গ তাঁরা বর্জন করেই থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, এমন কি ভরত মহারাজ, বাসদেব এবং শুকদেব গোস্বামীও নির্বিচারে তাঁদের কৃপা প্রদর্শন করেন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এক বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবভক্ত প্রচারক যে বৈষম্যভাব উপযোগ করে থাকেন, তাতে কোন প্রকারেই কৃপার অভাব প্রকাশ পায় না। তিনি বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং তার ভক্তবৃন্দের প্রতি যারা বিদ্বেষী, তাদের উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করাই যথার্থ প্রতিষেধক, যা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। প্রচারকের দিক থেকে নিস্পৃহভাবের ফলে উভয়পক্ষেরই হিংসাত্মক মনোভাব প্রতিরোধ করা যায়। যদিও বৈদিক অনুশাসনে রয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তগণের অবমাননা যে করে, তার জিভ কেটে ফেলা উচিত, তা হলেও এই যুগে যথার্থ অবজ্ঞাকারীদের শুধুমাত্র পরিহার করে চলাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং ঐভাবেই বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে তাদের আরও বেশি পাপকর্ম অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি থেকে তাদের নিরস্ত করা ভাল। বৈষ্ণব প্রচারকের কর্তব্য এই যে, পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনও পন্থা যে নিরর্থক, তা প্রতিপন্ন করতে হবে। অবশ্যই কোনও বিদ্বেষভাবাপন্ন মানুষ বৈষ্ণবগণের দৃঢ়চিত্ত প্রচার কার্যক্রমে বিরক্তি প্রকাশই করবে,

কারণ তার বিবেচনায় ভক্ত-প্রচারক অন্যদের অকারণে সমালোচনা করতে চাইছে। ঐ ধরনের যে-মানুষ বৈষ্ণবদের কৃপার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করে না, তাদের অবজ্ঞা করাই উচিত। নচেৎ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, তার প্রবঞ্চনামূলক মনোবৃত্তি দিনে-দিনে বেড়েই চলতে থাকবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট হয় না এবং যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত সেবকবৃন্দের অশ্রদ্ধা করে যেন তাঁদের সংকীর্তন আন্দোলন সম্পর্কিত সুদৃঢ় মতবাদগুলি তাদের নিজ নিজ ভগবৎ-উপাসনার পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, তারা কখনই কৃষ্ণভাবনায় মতি স্থির করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ আরাধনার সঙ্গে জড়বাদী জগতের বাহ্যিক কর্মকলাপের বিভ্রান্তিবশত ভক্তিমার্গ থেকে তারা ক্রমশই বিচ্যুত হয়ে পড়তে থাকবে। এই ধরনের বিভ্রান্তির কথাই *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ঐ ধরনের মূর্খ ব্যক্তিদের সুদৃঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তারা কৃপা বিতরণ এবং সমদৃষ্টির অজুহাতে ধারণা পোষণ করে থাকে যে, অবিশ্বাসী মানুষও পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত এবং তারা ঐভাবেই হরিনাম অর্থাৎ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম ঐ ধরনের অবিশ্বাসী বিদ্বেষী মানুষদের ওপরে আরোপ করতে চেষ্টা করে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "যখন শিশুসুলভ লোকেরা নিজেদের মহাভাগবত মনে করে এবং বৈষ্ণব দীক্ষাগুরুর অবমাননাসূচক কাজ করতে থাকে, এখন ঐ ধরনের আচরণের ফলে তারা নিতান্তই বৈষ্ণব গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। মিথ্যা আত্মম্ভরিতায় বিভ্রান্ত হওয়ার ফলেই, এই সমস্ত স্বঘোষিত ভক্তেরা মধ্যম পর্যায়ে শুদ্ধ ভক্তদের কাছে অবহেলার যোগ্য হতে থাকে এবং ভক্তদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে লব্ধ কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। তাই যাঁরা পবিত্র কৃষ্ণনাম প্রচারে নিয়োজিত আছেন, সেই ধরনের ভক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণাদি ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে তারা অসাধু হয়ে ওঠে। সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্ত বলে নিজেদের বৃথাই কল্পনা করে যারা, তাদের সকল সময়েই শুদ্ধ ভক্তগণ অবজ্ঞা করেই চলেন। এই ধরনের অবজ্ঞা তাদের প্রতি কৃপা বিতরণেরই এক চমৎকার অভিপ্রকাশ বটে।" পক্ষান্তরে বলা চলে, ভগবৎ-কৃপালাভে যাঁরা যোগ্য এবং যারা কেবলই বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদের মধ্যে বৈষম্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিন্দামন্দ করলে কেবলই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

এই ব্রহ্মাণ্ডে দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে অন্যতম শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মতো মহান বৈষ্ণব দুষ্ট কংসের নিন্দায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, মহাভাগবত ভক্ত যদিও প্রচার কার্যের জন্য মধ্যম শ্রেণীর পর্যায়ে কাজ করতে পারেন, তা সত্ত্বেও বিদ্বেষভাবাপন্ন জীবকে নস্যাৎ করবার সময়ে তিনি প্রচারের মধ্যম শ্রেণীর স্তরে কাজ করতে পারেন, তার ফলে বিদ্বেষপরায়ণ জীবকে পরিহারের মাধ্যমে শ্রীভগবানের সর্বত্র বিদ্যমানতা সম্পর্কে তাঁর দর্শনচিন্তার বিঘ্ন হয় না। বরং, যখনই কোনও উত্তম ভক্ত কিংবা মধ্যম ভক্তও ভগবদ্-বিমুখ মানুষদের বর্জন করেন, তখনও তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধন করে থাকেন। উত্তম ভক্ত কিংবা মধ্যম ভক্ত বৈষ্ণব কখনই বাস্তবপক্ষে অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না, তবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর প্রেমের কারণেই তিনি যখন শ্রীভগবানের সম্মান-মর্যাদার হানি হতে দেখেন, তখন তিনি মর্মাহত হন। তা ছাড়া, শ্রীভগবানের অভিলাষ উপলব্ধি করার ফলে, কোনও বিশেষ জীবের মর্যাদা অনুসারে সিদ্ধান্ত বিচার করে থাকেন। এই ধরনের বৈষ্ণব প্রচারককে একজন সাধারণ, ঈর্ষাকাতর মানুষ বলে মনে করা, কিংবা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই সকল প্রকার পারমার্থিক প্রগতির সর্বোত্তম পন্থারূপে তাঁর অনুশাসন থেকে জড় জাগতিক জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তথা *বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ* কিংবা *গুরুষু নরমতিঃ* ধারণা করলে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ পায়। প্রকৃতির নিয়মে ঐ ধরনের অপরাধের ফলে মানুষ নারকীয় জীবনধারায় অধঃপতিত হয়ে থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, যদিও মহাভাগবত ব্যক্তি প্রত্যেক জীবকেই শুদ্ধ জীবাত্মারূপে মর্যাদা প্রদান করে থাকেন, তবুও ঐ ধরনের মহাভাগবত ব্যক্তি অন্য কোনও বৈষ্ণবজনের সাক্ষাৎ লাভ করলে বিশেষ ভাবোল্লাস উপলব্ধি করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেও তাঁর দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা স্ববিরোধী নয়; বরং এর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের লক্ষণই তাই। শুদ্ধ ভক্ত প্রত্যেক জীবকেই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ রূপে দর্শন করেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকাশ এবং সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার মাধ্যমেই তাঁর কৃষ্ণপ্রেম অভিব্যক্ত করে থাকেন। তা সত্ত্বেও এই ধরনের মহাভাগবত যখন লক্ষ্য করেন যে, পরমেশ্বর

ভগবানের আনন্দ সুখ অন্য একজন জীবও অনুভব করছে, তখন মহাভাগবতের দিব্য উল্লাস জাগে। এই ধরনের মনোভাব প্রচেতাবর্গের প্রতি দেবাদিদেব মহাদেবের বক্তব্য থেকেই প্রকটিত হয়েছে—

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

"কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণার্ধের জন্যও ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ পান, তা হলে তাঁর কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রতি আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। তা হলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন, তাঁদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?" (*ভাগবত* ৪/২৪/৫৭) তেমনই, দেবাদিদেব মহাদেব বলেছেন—

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়া স্থ ভগবান্ যথা ।
ন মদ্ভাগবতানাং চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥

"তোমরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, তাই আমার কাছে তোমরা স্বয়ং ভগবানের মতো শ্রদ্ধাভাজন। সেই সূত্রে আমি জানি যে, ভক্তেরাও আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং আমি তাঁদের বিশেষ প্রিয়ভাজন। তাই ভক্তদের কাছে আমার মতো প্রিয় আর কেউ নয়।" (*ভাগবত* ৪/২৪/৩০) সেইভাবেই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৭/১১) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে *নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ* অর্থাৎ শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের বিশেষ প্রীতিভাজন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থাবলীতে লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিস্ময়কর প্রেমের আদান-প্রদান বর্ণনা করা আছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, বৈষ্ণবগণ যদিও প্রত্যেক জীবের মাঝেই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন অংশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলেও তাঁর আচরণের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় অবশ্যই করে থাকেন, যার ফলে শ্রীভগবানের সৃষ্টি কর্মের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়—উদ্দেশ্যটি হল এই যে, জীবকুলকে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে যাতে তারা ক্রমশ নিজধামে তথা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। শুদ্ধ ভক্ত নির্বোধের মতো ভাব দেখান না যেন তাঁর সমদর্শিতা আছে এবং সকল ঈর্ষাকাতর মানুষকেই সমদর্শী মনোভাবে আচরণ করে থাকেন; বরং, তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যটিকে শ্রদ্ধা করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* কথাগুলির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে, শ্রীভগবানের অভিলাষ যদি তেমন হয়, শুদ্ধ ভক্ত সকল জীবকেই তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব এবং অন্যান্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ দুর্যোধনের মতো মানুষদের প্রতিও সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপনে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মধ্যম অধিকারী ভক্তেরা অবশ্য সেই ধরনের উত্তম অধিকারী ভক্তদের অনুকরণ করবেন না। এই প্রসঙ্গে মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন—*অত্র সর্বভূতেষু ভগবদ্দর্শনযোগ্যতা যস্য কদাচিদপি ন দৃষ্টা।* মধ্যম অধিকারী কোনও সময়েই সকল জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি অনুধাবন করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে উত্তম অধিকারী শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার অভিলাষে দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য অনুসারে উদ্যোগী হতে পারেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, প্রত্যেক জীবই পরিণামে বিস্মৃতিপরায়ণ কৃষ্ণভাবনাময় জীবেরই অংশমাত্র। তাই কোনও ভক্ত হয়ত তার আচরণের বহিঃপ্রকাশে চার প্রকার আচরণ অনুসরণ করতে পারে, যে কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে—যেমন, ভগবদ্ উপাসনা, ভক্তজনের সখ্যতা, নিরীহ মানুষদের মধ্যে প্রচার উদ্যোগ, এবং অসুর প্রকৃতির মানুষদের বর্জন। এই সব সত্ত্বেও ভক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হন না, কারণ উত্তম অধিকারীও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য পরিপূরণের লক্ষ্যে কর্মোদ্যোগের লক্ষণ প্রকাশ করতেও পারেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, উত্তম অধিকারীর দক্ষিণ হস্তরূপে সকলের কল্যাণার্থে কর্মোদ্যোগের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এবং কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে সাহায্য সহযোগিতার অঙ্গীকারে মধ্যম অধিকারী নিজেকে উৎসর্গ করবেন, সেটাই তাঁর কর্তব্য।

পরিশেষে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অর্চনা এবং ভজনার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে এক মনোরম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অর্চনা বলতে বোঝায় সাধনভক্তির পর্যায়, যখন মানুষ শ্রীভগবানকে সেবার মাধ্যমে পদ্ধতিগত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চলে। শ্রীভগবানের দিব্যপবিত্র নামের আশ্রয় যে মানুষ গ্রহণ করেছে, এবং ভগবানের সেবা অভিলাষে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছে, তাকে ভজন পর্যায়ে অবস্থিত মনে করতে হবে, যদিও তার বহির্জগতের কাজকর্ম কখনও বা অর্চনা পদ্ধতিতে নিয়োজিত কনিষ্ঠ ভক্তদের চেয়েও কঠোরতর হতে পারে। যাই হোক, কঠোরতার এই আপাত শিথিলতা সুস্থ আচরণ নীতির মূল নীতিগুলির লঘুতা প্রতিপন্নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, তবে সেইগুলির মাধ্যমে সুস্থ আচরণের মূল নীতিগুলিরই শিথিলতা করা চলে না, তবে সেগুলি বৈষ্ণব উৎসব আচরণে বিশদভাবে পালন করা চলে।

শ্লোক ৪৭

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

অর্চায়াম্—অর্চাবিগ্রহ; **এব**—অবশ্যই; **হরয়ে**—শ্রীহরির প্রতি; **পূজাম্**—পূজা; **যঃ**—যিনি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ঈহতে**—নিয়োজিত করেন; **ন**—না; **তৎ**—শ্রীকৃষ্ণের; **ভক্তেষু**—ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে; **চ**—এবং; **অন্যেষু**—সাধারণ জনগণের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **ভক্তঃ প্রাকৃতঃ**—বস্তুবাদী ভক্ত; **স্মৃতঃ**—বলা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজায় নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কিংবা জনসাধারণের প্রতি যথাযথ আচরণ করেন না, তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত তথা নিম্নাধিকারী বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজা করে থাকে, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান যে বাস্তবিকই সর্বব্যাপী, তা সে অবহিত নয়। এই ধরনেরই মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে মানুষ তাদের ঘরে-বাড়িতে এবং পথে ঘাটে যত রকমের পাপকার্য সম্পন্ন করতে থাকে, কিন্তু তারপরে ধর্মভাব অবলম্বন করে গির্জায় যায় আর শ্রীভগবানের কাছে কৃপা প্রার্থনা করে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবান আমাদের ঘরেই রয়েছেন, শ্রীভগবান পথে ঘাটে রয়েছেন, শ্রীভগবান আমাদের কাজকর্মের সর্বত্র অফিস-কাছারীতেও রয়েছেন, শ্রীভগবান বনে-জঙ্গলেও আছেন, শ্রীভগবান সর্বত্রই রয়েছেন, এবং তাই শ্রীভগবানের চরণকমলে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁকে সদা সর্বদা সবজায়গাতেই আরাধনা জানানো উচিত। তাই এই অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্ ।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

"ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষগুল্মাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—যা কিছুই ভক্ত দেখতে পান,

তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমগ্র অংশ-প্রকাশকে তাঁর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করাই ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য।" শ্রীভগবানের মহাভাগবত ভক্তের তত্ত্বদর্শন এই রকমই হয়ে থাকে।

শ্রীল মধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভগবদ্ভক্ত মধ্যম অধিকারী, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্ব কারণের কারণ বলে মানেন এবং সেইভাবে ভগবৎপ্রেম নিবেদন করেন। এই ধরনের ভক্ত অন্য সকল ভক্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকেন এবং তিনি অজ্ঞজনকে কৃপা করেন আর ভগবৎ-বিদ্বেষীদের সংস্রব ত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও, *তদ্বশত্বং ন জানাতি সর্বস্য জগতোঽপি তু*—পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপী গুণবৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদি সাধারণভাবে তাঁর জ্ঞান আছে যে, প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যেই জন্মলাভ করেছেন এবং তিনি সবকিছুই কৃষ্ণসেবায় উপযোগের প্রচেষ্টা করে থাকেন, তিনি যথার্থই সচেতন যে, সব কিছুই শ্রীভগবানের আয়ত্তাধীন সত্ত্বা, তা সত্ত্বেও ভগবদ্ বিদ্বেষী মানুষদের সঙ্গদোষে তিনি বিভ্রান্তি বোধ করতেও পারেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন, *অর্চায়াম্ এব সংস্থিতম্ / বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা তদন্যত্রে নৈব জানাতি যঃ পুমান্।* কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের কোনই ধারণা হয় না যে, গির্জা কিংবা মন্দিরের বাইরে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাজিত থাকার কোনও সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত তার নিজের উৎসব-অনুষ্ঠান মণ্ডিত পূজা-অর্চনার পদ্ধতি মাধ্যমে ভক্তি অনুশীলনে এমনই দর্পবোধ করতে থাকে (*আত্মনো ভক্তিদর্পতঃ*) যে, তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না—তার চেয়ে অধিকতর ধর্মপ্রাণ পুণ্যবান মানুষ অন্য কেউ হতে পারে, এবং সে এটাও জানে না যে, অন্য সকল ভক্তবৃন্দ আরও কতখানি উন্নত হয়ে উঠেছেন। তাই সে বুঝতে পারে না যে, মধ্যম কিংবা উত্তম অধিকারী ভক্তদের ভগবদ্ভক্তির উচ্চমান কেমন ধরনের হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই, তার মিথ্যা দর্পবোধের ফলে, সে উন্নত ভগবদ্ভক্তদের নিন্দামন্দ করে, তাঁদের অবজ্ঞা করে, কিংবা সেই সব প্রচারক অথবা সম্পূর্ণ আত্ম উপলব্ধিসম্পন্ন উন্নত জীবাত্মা রূপে তাঁদের সমুন্নত মর্যাদা সম্পর্কে কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের আরও একটি লক্ষণ এই যে, মহান জড়বাদী ব্যক্তিবিশেষ রূপে পরিচিত মানুষদের জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্যের জৌলুষে সে

উল্লসিত হয়ে থাকে। তার নিজের জীবনে দেহাত্মবুদ্ধি পোষণের ফলে অর্থাৎ নিজের দেহটিকে আত্মস্বরূপ জ্ঞানের পরিণামে, জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সম্পদের দ্বারা সে আকৃষ্ট হয় এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে থাকে। তাই, কোনও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত ভগবদ্‌বিরোধী অভক্তদের সমালোচনা করতে থাকলে, ঐ ধরনের কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বিচলিত বোধ করে। কৃপা অথবা করুণার নামে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত ঐ ধরনের জড়বাদী মানুষদের ভগবদ্ভক্তি বিবর্জিত কার্যকলাপ অনুমোদন করতে থাকে। যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উচ্চ পর্যায়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অপরিমিত দিব্য আনন্দের কথা জানে না, তাই সে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন পর্বটিকে নিতান্তই জীবনের ধর্মাচরণের প্রসঙ্গ বলেই বিবেচনা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে করে যে, জীবনে অনেক উপভোগ্য এবং যথার্থ কার্যকরী ভগবদ্ভক্তি বিবর্জিত বিষয়াদিও রয়েছে। তাই যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ, যারা সকল বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান উপলব্ধি করতে থাকে, তারা অভক্তদের সমালোচনা করতে থাকলে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত রাগান্বিত হয়। মধ্বাচার্য বলেছেন যে, ঐ ধরনের মানুষের যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রাথমিক বিশ্বাস ভরসা থাকে, তাই তাকে ভক্ত রূপেই গণ্য করা হয়ে থাকে, কিন্তু তাকে 'ভক্তাধম' বলা হয় অর্থাৎ সে অধম শ্রেণীর ভক্ত। যদি ঐ ধরনের জড়বাদী ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহ অর্চনার বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করতে থাকে, তবে তারা ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং অন্য কোনও ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণ না করলে অবশেষে তারা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠবে—অন্যান্য ভক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে তাদের সেই উন্নতি ব্যাহত হবে।

শ্রীল মধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন, *তদ্ভক্তানাম্ উপেক্ষকাঃ কুর্যুর্বিষ্ণাবপি দ্বেষম্।* ভগবদ্ভক্তদের প্রতি যারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তারা শ্রীবিষ্ণুর চরণে অপরাধী রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। সেইভাবেই, যারা দেবতাদের অশ্রদ্ধা করে, তারা ভক্তি অনুশীলনে বঞ্চিত হবে এবং এই সংসারচক্রে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বারে বারে ঘুরতে বাধ্য হবে। *পূজ্যা দেবতততঃ সদা*—দেবতাদের সর্বদাই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়, যেহেতু তাঁরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভক্তমণ্ডলী। যদি কেউ দেবতাদের বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, তবে সে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকবে। ঠিক সেইভাবেই, দেবতাদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলে পরমেশ্বর ভগবানকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। কোনও বৈষ্ণব নির্বোধের মতো মনে করেন না যে, অনেক ভগবান রয়েছেন। তিনি জানেন যে, একমাত্র পরম

পুরুষোত্তম ভগবান রয়েছেন। তবে বহু বার *শ্রীমদ্ভাগবতে* যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে এই জড়বাদী জগতে শ্রীভগবানের এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, যা হল এই যে, প্রকৃতির নির্মম বিধিনিয়মাদি মধ্যে দিয়ে বদ্ধ জীবকুলকে সংস্কার করে তুলতে হবে। এই জগতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে, দেবতাগণকে শ্রীভগবানেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে বিবেচনা করতে হবে। সেই বিষয়ে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড়জাগতিক কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়, তারা অন্যান্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের নিজ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি অনুসারে নিয়মাদি পালনের মাধ্যমে অন্যান্য বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে থাকে।" তবে ভক্তদের মধ্যেই অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ লাভের বাসনায় দেবতাদের পূজা করেন। গোপীরা দেবতাদের পূজা করেছিলেন যাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পেতে পারেন, এবং তেমনই রুক্মিণীদেবী তাঁর বিবাহের দিনে, ঐভাবেই দেব-উপাসনায় নিয়োজিত হন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এমন কি আজও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকমণ্ডলী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পূর্ণ বিনয় নম্রতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে জনসংযোগ গড়ে তুলছেন যাতে ঐ সমস্ত ধনবান কিংবা প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা সারা পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের সম্পদ-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিসেবা অনুশীলনের কাজে নিয়োগ করতে থাকবেন। ঠিক সেইভাবেই, দেবতারা যাতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের অনুকূলে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেন, সেই উদ্দেশ্যে দেবতাদের প্রতি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা নিবেদন ভক্তিমার্গের পরিপন্থী নয়, যদিও আজকাল ঐ ধরনের দেব-আরাধনাও নিম্নগামী হয়ে গিয়েছে। অতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ-কীর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, যা বর্তমান যুগে একমাত্র বাস্তবসম্মত পন্থা। তাহলেও, ভগবদ্ভক্ত *ভগবদ্গীতার* অনুশাসন মতো দেবতাদের বিরুদ্ধে গীতার অপব্যাখ্যা করে দেবতাদের অবমাননা করতে পারেন না, কারণ তাঁরা সকলেই যথার্থ বৈষ্ণব।

শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

বিষ্ণোরুপেক্ষকং সর্বে বিদ্বিষন্ত্যধিকং সুরাঃ ।
পতন্ত্যবশ্যং তমসি হরিণা তৈশ্চ পাতিতঃ ॥

"ভগবান বিষ্ণুকে যে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, সকল দেবতাই তার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। বিষ্ণুবিদ্বেষী তেমন মানুষকে শ্রীভগবান এবং দেবতাগণও ঘোর তমসাময় জীবনে নিক্ষেপ করে থাকেন।" শ্রীল মধ্বাচার্যের এই মন্তব্য থেকে দেবতাগণের ভগবদ্ভক্তিমূলক মনোভাব বুঝতে পারা যায়। বলা হয় যে, শ্রীভগবানের পরম উন্নত উত্তম অধিকারী ভক্ত শ্রেষ্ঠ মুক্তি অর্জন করলে তিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং দেবতাদেরও প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভের দিব্য সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী যথাযথভাবে অন্যান্য ভক্তদের শ্রদ্ধা করতে পারে না, সেজন্য তারা অবশ্যই সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা একেবারেই ভক্ত নয়, তাদের শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হবেই, তাই কনিষ্ঠ অধিকারী উপলব্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত না হওয়া অবধি বাস্তবক্ষেত্রে প্রচার-কার্যে অনুপযুক্ত হয়েই থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন, *ইয়ং চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থবিধারণজাতা*: যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারীর বিশ্বাস যথার্থভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদি-নির্ভর নয়, সেই কারণে প্রত্যেকেরই অন্তরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমাময় অধিষ্ঠানের তত্ত্ব সে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং সে যথার্থভাবে ভগবৎ-প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করতে পারে না, তা ছাড়া ভগবদ্ভক্তদের মহান মর্যাদাও সে উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহামহিমান্বিত, তাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও মহিমামণ্ডিত। কিন্তু এই তত্ত্বটি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের কাছে অজানা। ঠিক তেমনই, কোনও বৈষ্ণবের যে একান্ত যোগ্যতা—অন্য সকলকে সর্বপ্রকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা (*অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*), সেই গুণটিও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের মাঝে সুস্পষ্টভাবেই অনুপস্থিত, তা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তেমন কোন মানুষ যদি বৈদিক শাস্ত্রাদি সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মন্তব্যগুলি উপলব্ধির চেষ্টা করে, তা হলে ক্রমান্বয়ে সে দ্বিতীয় এবং প্রথম-পর্যায়ের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের স্তরে উন্নীত হবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে অতি আগ্রহ সহকারে নিয়মিত বিধি অনুসারে শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে হবে। শ্রীবিগ্রহ বাস্তবিকই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এক বিশেষ অবতার রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর আরাধনাকারীর সামনে পাঁচটি বিভিন্ন রূপবৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম, সেইগুলি হল—শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁর আদি অকৃত্রিম রূপ (*পর*), তাঁর চতুর্ভুজ আত্মপ্রকাশ (*ব্যূহ*), তাঁর লীলাময় অবতার রূপগুলি (*বৈভব*), পরমাত্মা (*অন্তর্যামী*) এবং শ্রীবিগ্রহ (*অর্চা*)। শ্রীবিগ্রহ রূপ (*অর্চা*)-এর

মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন, যিনি পর্যায়ক্রমে শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাময় রূপ (*বৈভব*)-এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের *বৈভবপ্রকাশ* তাঁর *চতুর্ব্যূহ* রূপেরই এক উদ্ভব। শ্রীভগবানের এই চতুর্ব্যূহ অংশপ্রকাশ বাসুদেবরূপ পরমতত্ত্বের মাঝেই বিরাজমান, আর বাসুদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন *স্বয়ংপ্রকাশ* তত্ত্বের মাঝে। এই *স্বয়ংপ্রকাশ* তত্ত্ব চিদাকাশে গোলোক বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আদিরূপ *স্বয়ংরূপ* তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশের এই ক্রমানুবর্ত অবশ্য জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যেও ভগবৎ-সেবার আগ্রহাতিশয্যের স্তর অনুসারে উপলব্ধি করা যায়। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রারম্ভিক অনুশীলনকারী ভক্ত শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানে তার সর্বপ্রকার কার্যকলাপ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে প্রয়াসী হলে এবং মন্দিরে কৃষ্ণ আরাধনায় অভিনিবেশ করলে তার উপলব্ধির বিকাশ হতে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের উল্লিখিত সকল অংশপ্রকাশ এই জগতে অবতীর্ণ হন এবং শ্রীবিগ্রহে অধিষ্ঠিত হন, এবং সেই বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ দৈনন্দিন জীবনধারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরমাত্মার কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে থাকেন। শ্রীভগবানের বৈভব, অর্থাৎ লীলাবিলাসময় অংশপ্রকাশ বিশেষ নির্ধারিত কাল-পর্যায়ে আবির্ভূত হলেও (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*), পরমাত্মাস্বরূপ অন্তর্যামী এবং অর্চাবিগ্রহরূপ এই ভূমণ্ডলে ভক্তসমাজের পারমার্থিক বিকাশার্থে সদাসর্বদাই সহজলভ্য হয়ে থাকে। যে কোনও মানুষ মধ্যম অধিকারী ভক্তের পর্যায়ে উপনীত হলেই, পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশাদির মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তেমনই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের অন্তরে শ্রীভগবানের সমগ্র জ্ঞান উপলব্ধি অর্চা-বিগ্রহের মাঝেই কেবল সীমায়িত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্নতম স্তরের মানুষদেরও উদ্দীপিত করার মানসে তিনি তাঁর বিবিধ রূপই শ্রীবিগ্রহের মধ্যে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন যার ফলে শ্রীবিগ্রহ অর্চনার মাধ্যমে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত যেন শ্রীভগবানের সকল রূপেরই আরাধনা করতে থাকে। ভক্ত যেভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকে, সেইভাবেই তার উপলব্ধি হতেও থাকে যে, এই সকল বিভিন্ন রূপ নিজ প্রক্রিয়ায় এই জগতে এবং চিদাকাশেও প্রকটিত হয়ে রয়েছেন।

মানুষ যতদিন তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থান করতে থাকে, ততদিন তারপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-পরিকরাদি এবং পরিভ্রমণ সূচীর লীলাস্থলীগুলির পরমানন্দময় বাস্তব অস্তিত্বের অপ্রাকৃত অনুভব করা সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবিশেষ

প্রীতিলাভ করেছিলেন, যখন রাজা প্রতাপরুদ্র একদা মহাপ্রভুর একখণ্ড বহিরাবাস বস্ত্র লাভ করে তৎক্ষণাৎ সেটি শ্রীবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটিকেই স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু-জ্ঞানে অর্চনা-আরাধনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং বলেছিলেন, *তস্মাদ্ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্*। শ্রীভগবানের লীলা পরিকরাদি, লীলাস্থলী কিংবা লীলাবিভোর ভক্তমণ্ডলীর অর্চনা-আরাধনা অবশ্যই শ্রীভগবানের অর্চনা-আরাধনার চেয়েও উত্তমোত্তম প্রচেষ্টা-প্রয়াসরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে, কারণ শ্রীভগবান তাঁর আপন পূজা-অর্চনার চেয়ে ভক্তমণ্ডলীর এবং লীলাস্থলীর পূজা-অর্চনায় অধিকতর প্রীতিলাভ করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে ভগবানের ভক্ত, পার্ষদ ও বিভিন্ন উপকরণের প্রতি কনিষ্ঠ অধিকারীর সম্মান প্রদর্শন না করা ব্যাপারটি এই ইঙ্গিতই করে যে এই ধরনের জাগতিক মনোভাবাপন্ন বৈষ্ণবেরা তখনও পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণকামী ও নির্বিশেষবাদী কর্ম-বাদী বা মায়াবাদীদের কল্পনাপ্রসূত বোধ দ্বারা প্রভাবিত থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও কখনও বলতেন, কেবলমাত্র নির্বিশেষ-বাদীরাই কৃষ্ণকে এককরূপে দর্শন করতে চায়। কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে তাঁর গো-বৎস, তাঁর সখা, তাঁর পিতা-মাতা, তাঁর গোপীগণ, তাঁর বাঁশী, রত্নালঙ্কার, অরণ্য ইত্যাদি সহ দর্শন করতে অভিলাষী। কৃষ্ণের বৃন্দাবন রূপ হচ্ছে সবচেয়ে সমুজ্জ্বল। এই বৃন্দাবনভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু সুন্দর পার্ষদগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর সমুজ্জ্বল, অবর্ণনীয় সুন্দর রূপকে প্রকাশ করেছিলেন। একইভাবে, অহৈতুকীভাবে সারা বিশ্বপরিভ্রমণ করে বদ্ধজীবের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা বিতরণকারী তাঁর শুদ্ধভক্তগণের কার্যাবলীর মধ্য দিয়েই পরমেশ্বর ভগবানের অনুপম কৃপা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যাদের কেবল লোক দেখানো ধারণা রয়েছে তারাই ভগবানের সাজসরঞ্জাম, পার্ষদ ও ভক্তগণের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে না। জীবন-বোধ, নির্বিশেষ ও ইন্দ্রিয়জ ধারণা দ্বারা দূষিত হওয়ার ফলেই এমনটি ঘটে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বহিরঙ্গা পরিকরাদি সম্বলিত ভগবান শ্রীবাসুদেবের শ্রীবিগ্রহ শত শত জীবনব্যাপী নিষ্ঠাভরে পূজা-অর্চনা করবার পরে, মানুষ শ্রীভগবানের দিব্যনাম এবং মন্ত্রাবলীর যথার্থ ভাব-প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলেই জড় জাগতিক মানসিকতার বন্ধনদশা থেকে সে তখন শিথিলতা অনুভব করতে থাকে। সে তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা প্রদর্শন করে এবং শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় সন্তানাদি স্বরূপ ভক্তমণ্ডলীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে, এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে

ভক্তিময় সেবা অনুশীলনের বিশ্ববন্দিত গুণবৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা স্বীকার করে সে শ্রীভগবানের সেবায় অপরাপর সরলপ্রাণ নিষ্পাপ অপাপবিদ্ধ মানুষদেরও নিয়োজিত করবার জন্য অতীব আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। তা ছাড়াও, যেমনই বেশ কিছুটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সে অর্জন করতে থাকে, তেমনই সে তার ভক্তি অনুশীলনের জীবনে অগ্রগতি লাভের পরিপন্থী যে সব বিষয়বস্তু কিংবা যে সব মানুষ আছে, সেই সব কিছুরই প্রতি ক্রমশই বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে, এইভাবেই যে সমস্ত ভগবদ্-বিদ্বেষী মানুষদের সদুপদেশ দিলেও তারা কোনও মতেই উপকৃত হতে পারবে না, তাদের সঙ্গ সে বর্জন করতে থাকে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ১০৮ শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এমনই চমৎকার সংস্থা যে, এই সংঘটিকে যিনিই সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তিনি অচিরেই ভগবৎপ্রচার কার্যে নিয়োজিত হয়ে যান। সুতরাং এই সংঘের সদস্যদের পক্ষে অনতিবিলম্বে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মধ্যম অধিকারী পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বিপুল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যদি কেউ কৃষ্ণভাবনা চর্চার নামে ভগবৎ-কথা প্রচারের উদ্যোগ বর্জন করে এবং তার বদলে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থভাণ্ডার সংগ্রহের সচেষ্ট হয়, তবে সে অন্য সকল জীবের প্রতি ঈর্ষারই প্রকারান্তর অভিব্যক্ত করে মাত্র। এই ধরনের প্রবৃত্তি কনিষ্ঠ অধিকারী তথা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির লক্ষণও পরিচয় জ্ঞাপন করে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমতে, ৪৫ থেকে ৪৭ সংখ্যক শ্লোকগুলি মহারাজা নিমির দুটি প্রশ্ন—"শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের প্রকৃতি কি ধরনের হয়?" এবং "বৈষ্ণবদের সুনির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি কি কি?"—তারই উত্তর বিধৃত করে রয়েছে।

শ্লোক ৪৮

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি ।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে; **অর্থান্**—ইন্দ্রিয়াদির উপলক্ষ্যগুলি; **যঃ**—যিনি; **ন দ্বেষ্টি**—ঘৃণা বিদ্বেষ করেন না; **ন হৃষ্যতি**—আনন্দবোধ করেন না; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **মায়াম্**—মায়াশক্তি; **ইদম্**—এই বস্তুবাদী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **পশ্যন্**—যেভাবে দর্শন করে; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবত-উত্তমঃ**—প্রথম শ্রেণীর ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেও, যিনি এই সমগ্র জগতটিকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির অভিপ্রকাশরূপে দর্শন করে থাকেন, তিনি কোনও কিছুতেই দ্বেষ বা হর্ষযুক্ত হন না। তিনি অবশ্যই ভক্ত সমাজে উত্তম ভাগবত ব্যক্তি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, উত্তম অধিকারী তথা শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তের মর্যাদা এমনই পূজনীয় যে, এখন আটটি শ্লোকে অতিরিক্ত লক্ষণাদি পরিবেশিত হয়েছে। বোঝা উচিত যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণপদ্মের সংস্পর্শে সান্নিধ্যে কেউ না আসতে পারলে, তার পক্ষে জড়জাগতিক মায়াভ্রংশের পথ উপলব্ধি করা অতীব দুঃসাধ্য হয়। *শ্রীউপদেশামৃতের* পঞ্চম শ্লোকটিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্য অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদম্ ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা*—"যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবদ্-ভজনে প্রকৃতই উন্নত, যাঁর হৃদয় অন্যের নিন্দাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাঁর সঙ্গ করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করা উচিত।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "এই শ্লোকটিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করবার পরামর্শ দিয়েছেন। একজন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত কিংবা মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব ভক্তও গুরু হয়ে শিষ্যগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ঐসব শিষ্যেরাও একই স্তরে অবস্থান করতে থাকবে, এবং এই সম্বন্ধে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের কনিষ্ঠ অধিকারী গুরুর অধীনে জীবনের চরম সিদ্ধির অভিমুখে তারা বিশেষ অগ্রসর হতেই পারবে না। সুতরাং কোনও উত্তম অধিকারী ভক্তকেই গুরু রূপে স্বীকার করার জন্য শিষ্যকে যত্নবান হতে হবে।"

অতএব এখন যথার্থ গুরুর আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি বিবৃত করা হবে, যার ফলে নিজ ধামে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে অভিলাষী বদ্ধ জীব যথাযথভাবে সদ্গুরুর লক্ষণাদি চিহ্নিত করতে সক্ষম হতে পারে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এখন বিভিন্ন পর্যায়ের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে, শুদ্ধভক্তের গুণবৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কিত আটটি অতিরিক্ত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যাতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে কোনও ভুল না করে। তেমনই, *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় কোনও মানুষের লক্ষণাদি সম্পর্কে, এবং শ্রীকৃষ্ণ

বিশদভাবে *প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা*, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের লক্ষণাদি ব্যাখ্যাও করেছেন।

এই শ্লোকটিতে যে বিশেষ গুণবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তা হল—*বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্*—শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির অভিপ্রকাশরূপেই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত এই সমগ্র জগতটিকে দর্শন করে থাকেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই যা সম্পত্তি, তাই নিয়ে দুঃখ কিংবা আনন্দ প্রকাশের কোনই প্রশ্ন ওঠে না। এই জগতের মাঝে মানুষ কোনও আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হারানোর জন্য শোক প্রকাশ করে এবং তার বাসনা মতো বিষয় অর্জন করলে উল্লাস ব্যক্ত করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের যেহেতু কোনই আপন অভিলাষ থাকে না (*কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব 'শান্ত'*), তাই তার ক্ষেত্রে লাভ বা ক্ষতির কোনই প্রশ্ন থাকে না। শ্রীভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব অর্জন করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোনও কিছুর জন্য শোক করেন না কিংবা কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" তেমনই, দেবাদিদেব মহাদেব একদা মহারাজ চিত্রকেতুর চারিত্রিক মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেন,

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোনও অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি, এবং নরক সকলই সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সেবা অনুশীলনেই আগ্রহশীল হয়ে থাকেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে এইভাবে পূর্ণতৃপ্তি অর্জনের বিষয়টি শুধুমাত্র কৃত্রিম যোগাভ্যাস কিংবা ধ্যানচর্চার মাধ্যমে লব্ধ মানসিক জল্পনাকল্পনা নয়, বরং এই তৃপ্তি লাভের কারণ হল এই যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যিনি দিব্য আনন্দ রসের উৎস, তাঁর মহত্তম স্বরূপ উপলব্ধিরই ফললাভ এই ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে, *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।* যখন নিরীশ্বর নিরাকারবাদী এবং শূন্যবাদীরা

তাদের মন থেকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে জড়জাগতিক বিষয়াদি পরিয়ে দিতে চায়, তখন তাদের প্রবল দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গীতা ১২/৫)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে, নিরাকার নির্বিশেষবাদী মানুষকে পারমার্থিক মুক্তিলাভের পথে উন্নতি লাভ করতে হলে বিপুল অসুবিধা এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, কারণ প্রত্যেক জীবই নিত্য শাশ্বত পরম পুরুষের তথা শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র। মানুষ যখন তার ব্যক্তিসত্ত্বার ধারণা ত্যাগ করতে চায়, তখন সেটা তার পক্ষে জড়জাগতিক অহম্‌বোধেরই ভয়াবহ ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরিণাম বলে বুঝতে হবে। এই ধরনের সাধন প্রক্রিয়া মোটেই ইতিবাচক সুফলদায়ী উদ্যোগ নয়। যদি কারও হাতের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করতে থাকে, তা হলে হাতটিকে কেটে বাদ দিতে সে হয়ত রাজী হতে পারে, কিন্তু যথার্থ প্রতিকার করতে হলে হাতের যন্ত্রণার মূল কারণ যে বিষক্রিয়ার সংক্রমণ, সেটিকে দূর করাই যথার্থ সমাধান বলে স্বীকার করা উচিত, যাতে সুন্দর সুস্থ হাতটি আনন্দ সুখের উৎস হয়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনই, মানুষের অহম্‌বোধ, অর্থাৎ 'আমিই সব করছি' এই ধারণাটিই অপরিসীম নানাপ্রকার সুখ-আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে, যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি—আমরা কি ধরনের সত্ত্বা, অর্থাৎ আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস মাত্র—এই পরিচয় সত্ত্বা তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

নিরাকার নির্বিশেষ বিষয়ে ধ্যান চর্চা নিতান্তই শুষ্ক এবং কষ্টকর উদ্যোগ মাত্র। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত উপলব্ধি করে থাকেন যে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য শাশ্বত অবিচ্ছেদ্য অংশপ্রকাশ মাত্র, এবং শ্রীভগবানেরই সন্তানরূপে তাঁর সুযোগ রয়েছে যাতে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আনন্দময় নিত্যলীলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারেন এবং নিত্যকাল তাঁর সাথে খেলা করতে পারেন। সেই ধরনের ভক্তের কাছে নিষ্প্রভ জড়াপ্রকৃতি, যা চিন্ময় জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র, তা একেবারেই আকর্ষণীয় মনে হয় না। তাই, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্ত হয়েছেন এবং মায়ার সকল অভিব্যক্তিতে আকর্ষণ বোধ করেন না, তাঁকে ভাগবতোত্তম অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বলা যেতে পারে, যে কথা পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে (*ভক্তিঃ পরেশানুভাবো বিরক্তিরন্যত্র চ*) বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *বিষ্ণোর্মায়াং বিষ্ণুচ্ছাধীনাম্*—"*বিষ্ণোঃ মায়াম্* শব্দসমষ্টি এই শ্লোকটির মধ্যে নির্দেশ করছে যে, মায়ারূপ শক্তি সর্বদাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর

ইচ্ছাধীন রয়েছে।" ঠিক সেভাবেই *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৪) থেকে পাওয়া যাচ্ছে—*সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা*। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ছায়ার মতোই মায়া শ্রীভগবানকে এই জগতে তাঁর সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কাণ্ডে সেবা করে চলেছে। ছায়ার যেমন কোনও স্বতন্ত্র স্বাধীন চলৎশক্তি থাকে না—যার ছায়া তাকেই অনুসরণ করে চলতে হয়, শ্রীভগবানের মায়াময় শক্তিরও তেমন কোনই স্বতন্ত্র শক্তি থাকে না, শুধুমাত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই জীব সমাজকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যগুলির অন্যতম হল এই যে, তিনি তাঁর পরম শক্তিবলে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে রয়েছেন; যখন কোনও জীব তাঁকে ভুলে থাকতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তাঁর মায়াশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বদ্ধজীবের নির্বুদ্ধিতার সহযোগ করেই থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমতে, *গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্* শব্দগুলি বোঝাচ্ছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত এই জগতে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকেন না; বরং, তিনি সকল ইন্দ্রিয়াদির অধিকর্তা হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিই উপযোগ করতে থাকেন। *হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী যে সমস্ত জড় জাগতিক বস্তুকে কোনও মানুষ যদি নিছক জড় পদার্থ জ্ঞান করে পরিত্যাগ করে, এবং সেইগুলি পারমার্থিক প্রগতির পরিপন্থী বিবেচনা করে, তা হলে সন্ন্যাস গ্রহণ তথা ত্যাগের ধর্ম নিতান্তই ফল্গুবৈরাগ্য, অর্থাৎ অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ ত্যাগ ধর্ম বলে বিবেচনা করতে হবে। অপরপক্ষে, কোনও ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যক্তিগত অভিলাষ বর্জন করে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা মানসিকতায় সকল প্রকার জড়জাগতিক বস্তুই যিনি স্বীকার করে নেন, তিনি যথার্থই বৈরাগ্যধর্মী (*যুক্তং বৈরাগ্যম্ উচ্যতে*)।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যপ্রদান প্রসঙ্গে সতর্ক বাণী শুনিয়েছেন যে, উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী কিংবা কনিষ্ঠ অধিকারী—এই তিন শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে মানুষ নিরাকার নির্বিশেষবাদের বিভ্রান্তিকর পর্যায়ে অধঃপতিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের কল্যাণ সাধনের কিংবা নিজের মঙ্গল সাধনের সকল শক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পথে যারা উন্নতি লাভে প্রয়াসী, তাদের পক্ষে অন্যান্য বৈষ্ণবদের অযথা সমালোচনা করে নিজেদের পারমার্থিক অভিজ্ঞতা সঙ্কটাপন্ন করা অনুচিত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, যদি কেউ ফল্গুবৈরাগ্য অনুশীলন করতে থাকে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল জড়জাগতিক যে সমস্ত

সামগ্রী, তা সবই বর্জন করে, তা হলে নিরাকার নির্বিশেষবাদী দর্শনচিন্তায় তার মন কলুষিত হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। অপরপক্ষে, যুক্তবৈরাগ্যের নীতি অনুসরণে অটল বিশ্বাসী থাকলে, সমস্ত সামগ্রী থেকে ব্যক্তিগত অভিলাষ বর্জন করে সবই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে উপযোগ করলে, মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং ক্রমশই এই শ্লোকটিতে উল্লিখিত মহাভাগবত পর্যায়ে উপনীত হতে থাকে।

শ্লোক ৪৯

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৯ ॥

দেহ—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **ধিয়াম্**—এবং বুদ্ধি; **যঃ**—যে; **জন্ম**—জন্মসূত্রে; **অপ্যয়**—হ্রাস; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **ভয়**—ভীতি; **তর্ষ**—তৃষ্ণা; **কৃচ্ছ্রৈঃ**—কঠোর পরিশ্রমের ব্যথাবেদনা; **সংসার**—জড়জাগতিক জীবনের; **ধর্মৈঃ**—অবিচ্ছেদ্য গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা; **অভিমুহ্যমানঃ**—মুহ্যমান না হয়ে; **স্মৃত্যা**—স্মৃতিশক্তির ফলে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **ভাগবতপ্রধানঃ**—সকল ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী।

অনুবাদ

জড় জগতের মাঝে মানুষের দেহ নিত্যই জন্ম এবং জরাব্যাধির নিয়মাধীন হয়ে চলে। তেমনই, প্রাণশক্তিও ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বিব্রত হয়, মন নিয়ত উদ্বিগ্ন হয়, দুর্লভ বিষয়াদি অর্জনে বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি জড়া প্রকৃতির মাঝে অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অবশেষে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। যে মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অনিবার্য দুঃখকষ্টে বিভ্রান্ত না হয়, এবং শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমল স্মরণের মাধ্যমে ঐ সবকিছু থেকে নিস্পৃহ থাকে, তাকেই ভাগবতপ্রধান, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বলে মান্য করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্যের মতানুসারে এই জগতের মাঝে দেবতা, সাধারণ মানুষ, আর অসুর—এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন জীব আছে। সকল প্রকার শুভপ্রদ গুণাবলী ভূষিত জীবগণ, যাঁদের বলা চলে—সমুন্নত ভগবদ্ভক্ত—তাঁরা এই জগতে কিংবা

উচ্চতর গ্রহলোকে দেবতা নামে অভিহিত হন। সাধারণ মানুষেরা সচরাচর ভাল এবং মন্দ গুণাবলীর অধিকারী হয়, এবং এই ধরনের মিশ্র গুণের তারতম্য অনুযায়ী তারা এই পৃথিবীতে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে থাকে। কিন্তু সদ্‌গুণাবলীর অভাবে যারা সমাজে চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যারা ধর্মীয় জীবনধারা এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে থাকে, তাদের অসুর বা দানব বলা হয়ে থাকে।

এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে, সাধারণ মানুষ এবং অসুরগণ জন্ম, মৃত্যু এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত নানাপ্রকার জরাব্যাধির দ্বারা ভয়ানকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে, অথচ সৎ প্রকৃতির দেবতাগণ এই ধরনের শারীরিক যন্ত্রণাদি থেকে মুক্ত থাকেন। দেবতারা তাঁদের ধর্মসম্মত ক্রিয়াকর্মের সুফল স্বরূপ এই সকল দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভ করেন; কর্মগুণে তাঁরা এই জড়জাগতিক পৃথিবীর যতকিছু দুঃখকষ্ট, সেগুলি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/২০) শ্রীভগবান বলেছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

"ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গ কামনা করেন। তাঁরা পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে দিব্য স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।" কিন্তু *ভগবদ্গীতার* পরবর্তী শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, যখন পুণ্যফল ভোগের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন দেবতার মর্যাদা লুপ্ত হয় এবং স্বর্গরাজ্যের সকল সুখভোগ শেষ হয়ে গেলে তারা আবার নররূপে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির নিয়মবিধি এমনই সূক্ষ্ম যে, মানুষরূপেও পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব না হতে পারে, তবে কোনও কীটপতঙ্গ কিংবা বৃক্ষলতা রূপেও নিজ নিজ কর্মফলের বিশেষ পরিণাম বিশেষে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই জড়জাগতিক দুঃখদুর্দশা ভোগ করেন না, কারণ তিনি জীবনের দেহাত্মবুদ্ধি বর্জন করেছেন এবং নিজেকে নির্ভুলভাবেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাই, *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) স্বয়ং ভগবান যথার্থই বলেছেন যে, *সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্*। বিধিবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও, ভক্তিযোগ বিশেষ আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ঠিক

তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট সমসাময়িক ভক্ত শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বলেছেন, *সব অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দকন্দ।* যদিও বৈদিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন কাণ্ড অর্থাৎ বিভাগ রয়েছে—যেমন, কর্মকাণ্ড (কর্মফল প্রদায়ী যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান), এবং জ্ঞানকাণ্ড (বিধিবদ্ধ জ্ঞান অনুশীলন), তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনটি কেবল *আনন্দকন্দ* অর্থাৎ শুদ্ধ আনন্দময় ভক্তিমার্গ হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপভোগ্য প্রসাদমাত্র সেবনে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের মনোমুগ্ধকর লীলাকাহিনী শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত নামে অভিহিত আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে এই আনন্দসমুদ্রই প্রত্যেক জীবের নিত্য শাশ্বত প্রাপ্য সুখমর্যাদা, তবে তার জন্য তাকে জীবনের সব রকমের অনর্থক ধ্যানধারণা একেবারে বর্জন করতে হবে। তার স্থূল প্রকৃতির জড়জাগতিক দেহটিকে আপন সত্তা বলে পরিচয় প্রদান করা ছাড়তে হবে, চঞ্চল অস্থির মনকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, কষ্টকল্পনাপ্রবণ বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, আর বৌদ্ধরা যাকে শূন্যবাদ বলে থাকে, নির্বোধের মতো তেমন কোনও কষ্টকল্পনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে রাখার প্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। চতুর্দিকে চিন্ময় আকাশ পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যে সুবিশাল বহির্বিশ্বকে ব্রহ্মজ্যোতি নামে নিরাকার নির্বিশেষ চিন্ময় জীবনসত্তা উদ্ভাসিত করে রেখেছে, তার মাঝে নিজেকে একাত্মভাবে বিলীন করে দিতেও কোনও প্রচেষ্টার প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। বরং পরম ব্যক্তিসত্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যকালের জন্য এক সেবক ব্যক্তিসত্তারূপেই নিজেকে যথার্থভাবে পরিচিত করাই সমুচিত। এইভাবে আপন স্বরূপ সত্তা সম্পর্কে সরল মনে স্বীকারের মাধ্যমে এবং শ্রীভগবানের চরণপদ্মে সেবা নিবেদনের উদ্যোগে নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগের দ্বারা মানুষ অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা বিস্তারের মাঝে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে উন্নীত করতে পারে, ঠিক যেভাবে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে একজন সৈন্যের মতো অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাথে লীলা উপভোগের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

কিভাবে জড়জাগতিক দুঃখদুর্দশার উদ্ভব হয়, সেই প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীল মধ্বাচার্য। আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনও বদ্ধজীব যখন স্থূল জড় শরীরটাকেই আত্মা বলে মনে করে, তখন নিরন্তর অবসাদ আর অপূরণীয় যৌন কামনার জ্বালায় তার সমস্ত মানসিক শান্তি এবং স্থৈর্য ভস্মীভূত হয়ে যায়। কোনও আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষ যখন তার প্রাণ অর্থাৎ জীবনবায়ুর সাথে আত্মজ্ঞান

করে, তখন সে ক্ষুধায় জর্জরিত হতে থাকে, এবং মনের সাথে তার আত্মজ্ঞান হলে, তখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়, এবং লালসার তাড়নায় নিদারুণ কষ্ট ভোগের মাধ্যমে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়। যখন সে বুদ্ধির সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়, তখন অন্তস্তলে সে অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র তিক্ততা এবং চরম হতাশার বেদনায় নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। যখন সে নিজেকে বৃথা অহম্‌বোধের সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির প্রয়াসী হয়, তখন সে হীনমন্যতা ভোগ করে ভাবতে থাকে, "আমি এত নীচ, এত হীন প্রকৃতির জীব!" আর যখন সে স্বরূপ ভাবনার প্রক্রিয়ার সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির প্রয়াস করে, তখন সে অতীতের স্মৃতিবেদনায় বিভীষিকা বোধ করতে থাকে। যখন কোনও অসুর নিজেকে সকল জীবের অধিকর্তা বলে জাহির করতে চেষ্টা করে, তখন এই সমস্ত দুঃখকষ্ট এক সাথে বিস্তার লাভ করে।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের মতানুসারে, পাপময় জীবন ধারা নিতান্তই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আসুরিক মাপকাঠি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, আসুরিক সমাজ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রাত্রির গভীর অন্ধকার সময়গুলিকেই আমোদপ্রমোদমূলক কার্যকলাপের সব চেয়ে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যখন কোনও আসুরিক প্রকৃতির মানুষ শোনে যে, শ্রীভগবানের আরাধনার উপযুক্ত সময় অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে কেউ জেগে ওঠে, তখন সে আশ্চর্য এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই কারণেই *ভগবদ্গীতায়* (২/৬৯) হয়েছে,

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

"সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দ অনুভব করতে থাকেন; আর যখন সমস্ত জীব জেগে থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মসংযমী মানুষের কাছে রাত্রির মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হতে থাকে।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, এই জগতে দু'রকম বুদ্ধিমান মানুষ আছে। এক ধরনের বুদ্ধিমান মানুষ ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তি উদ্দেশ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে খুব উন্নতি লাভ করে, আর অন্য ধরনের বুদ্ধিমানেরা আত্মানুসন্ধানী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সদাজাগ্রত থাকে।"

এইভাবেই মানুষ যতই অবৈধ যৌন সংসর্গ, নেশাভাং, আমিষ আহার এবং জুয়া খেলার প্রবণতা বাড়িয়ে চলে, ততই সে আসুরিক সমাজে মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে, আর অন্যদিকে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের নির্ভরশীল

ভগবদ্ভক্তিসমৃদ্ধ সমাজে এই সমস্ত জিনিস সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবেই, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম ও লীলাপ্রসঙ্গে মানুষ যতই মহানন্দে আকৃষ্ট হতে থাকে, ততই আসুরিক সমাজের পরিবেশ থেকে ক্রমে ক্রমে সে বন্ধনমুক্ত হবে।

আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের আত্মম্ভরী প্রকাশ্য বৈরীভাবাপন্ন হয়ে থাকে, এবং ঈশ্বরের প্রভাব-প্রতিপত্তির রাজ্য সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-তামাশা করে। এই কারণে শ্রীল মধ্বাচার্য তাদের *অধোগতেঃ*, অর্থাৎ নরকের ঘোর অন্ধকার তমসার রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্রধারী বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে, জড়জাগতিক জীবনের দুঃখকষ্টে যদি কেউ অবিচল থাকে, তা হলে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মতোই একই চিন্ময় স্তরে মহানন্দে বিরাজ করতে থাকেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৫) বলা হয়েছে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যে জ্ঞানীব্যক্তি সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী।" এই অপ্রাকৃত দিব্য স্তরে মানুষ শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপাতেই উপনীত হতে পারে। শ্রীল মধ্বাচার্যের অপর একটি উপদেশবাণীতে রয়েছে—*সম্পূর্ণানুগ্রহাদ্ বিষ্ণোঃ*।

যে পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ উত্তম অধিকারী হয়ে ওঠে, তার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। কেউ যদি ভাগ্যবান হয়, তা হলে ক্রমশই সে কনিষ্ঠ অধিকারীর অতি সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যকলাপের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করতে থাকে এবং যে মধ্যম অধিকারী ভক্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠতেই হবে এবং শ্রীভগবানের উত্তম অধিকারী ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ জীবনের সার্বিক সিদ্ধি অর্জন করে থাকে, তা হলে তাঁরই প্রসারিত দর্শনতত্ত্বের সে প্রশংসা করতে শেখে। যতই কারও ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন ক্রমশ একাগ্র হতে থাকে এবং কোনও শুদ্ধ ভক্তের পাদপদ্ম থেকে সংগৃহীত রজের মাঝে বারংবার সুস্নাত হতে থাকে, ততই জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়ভীতি এবং সব কিছু ক্রমশই মনকে বিচলিত করা বন্ধ করে। তাই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/১১৪) রয়েছে—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে ।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥

"কোনও ভক্ত যথাযথভাবে গ্রাসাচ্ছাদনে বিভ্রান্ত হলেও, এই জড়জাগতিক ব্যর্থতার জন্য তাঁর মানসিক উদ্বেগ সৃষ্টির প্রয়োজন নেই; বরং তাঁর বুদ্ধি অনুসারে তাঁর

পরম প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকাই উচিত, তার ফলেই অবিচল থাকা যায়।" এইভাবে সকল পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণস্মরণের অভ্যাসে সুদৃঢ় হলে, তাঁকে *মহাভাগবতের* মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, শিশুর খেলনার বলটিতে একদিকে দড়ি বেঁধে দিলে সেটি যেমন লাফিয়ে চলে যেতে পারে না, তেমনই ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে বৈদিক অনুশাসনাদির বন্ধনে বাঁধা থাকে এবং জড়জাগতিক ব্যাপারে পথভ্রষ্ট কখনই হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *ঋগ্বেদ* (১/১৫৬/৩) থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।* "হে বিষ্ণু, আপনার নাম পূর্ণ দিব্যময়। সুতরাং এই নাম স্বয়ং প্রতিভাত। তা সত্ত্বেও, আপনার পবিত্র নাম মহিমা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম না হলেও, যদি এই নামের মহিমা সামান্যতম উপলব্ধি করেও, আমরা এই মহিমা অতি অল্প পরিমাণে পরিব্যাপ্ত করি—অর্থাৎ, যদি আপনার পবিত্র নামের অক্ষরগুলি শুধুমাত্র আবৃত্তি করতে থাকি—তা হলেই ক্রমশ আমরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।" *প্রণব* ওঁ শব্দের মাধ্যমে পরম সত্ত্বার যে অভিব্যক্তি হয়, তা যথার্থই *সৎ* অর্থাৎ স্বয়ং অভিব্যক্ত। তাই, কেউ যদি ভয়ভীতি কিংবা *ঈর্ষাদ্বেষে* বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলেও শ্রীভগবানের পবিত্রনাম যে জপ অভ্যাস করতে থাকে, তার কাছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দিব্যরূপ প্রতিভাত হয়। এই বিষয়ে আরও প্রমাণ দেওয়া হয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/২/১৪)—

সাঙ্কেত্যম্ পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনম্ এব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণম্ অশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

"অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসছলে হোক, সঙ্গীত বিনোদনের জন্য হোক, অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক, শ্রীভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।"

শ্লোক ৫০

ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

ন—কখনই নয়; **কাম**—কামনার; **কর্ম**—ফলাশ্রয়ীকর্ম; **বীজানাম্**—কিংবা ফলাশ্রয়ী সকল কর্মের মূল বীজস্বরূপ বস্তুবাদী জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বাসনাদির; **যস্য**—

যার; চেতসি—মনে; সম্ভবঃ—উদ্ভবের সম্ভাবনা; বাসুদেব-এক-নিলয়ঃ—যার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবই একমাত্র আশ্রয়; সঃ—তিনি; বৈ—অবশ্য; ভাগবত-উত্তমঃ—প্রথম শ্রেণীর ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ

যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়জাগতিক কামনা-বাসনাদির উপর নির্ভরশীল সকলপ্রকার ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকেন। বস্তুত, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেও মুক্তিলাভ করে থাকেন। যৌনতৃপ্তিভিত্তিক জীবনযাপন, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং অর্থ লাভের কোনও পরিকল্পনাও তাঁর মনে জাগে না। তাই, তাঁকে ভাগবতোত্তম, অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, ভগবদ্ভক্তের আচরণ সম্পর্কে এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধভক্তের কার্যকলাপের মধ্যে জড়জাগতিক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, মিথ্যা আত্মম্ভরিতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, এবং কামনাবাসনা থাকে না। বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণের অভিমতে, এই শ্লোকটিতে *বীজানাম্* শব্দটি *বাসনাঃ* অর্থাৎ অন্তস্থলের গভীর বাসনাদি বোঝায়, যেগুলি কালক্রমে এমন সব কাজকর্মের রূপ লাভ করতে থাকে, যার ফলে জীব কর্মফল ভোগের অধীন হয়ে পড়ে। সুতরাং *কাম-কর্ম-বীজানাম্* যৌগিক শব্দটি *ভাগবতের* (৫/৫/৮) শ্লোকে *গৃহ-ক্ষেত্র-সুতাপ্ত-বিত্তৈঃ*, অর্থাৎ, মনোরম বাসভবন এবং উদরপূর্তির জন্য উপাদেয় ভোজ্যবস্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ক্ষেতজমি, তা ছাড়া পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধব, সামাজিক প্রতিপত্তি আর বিপুল অর্থসঞ্চয় বোঝায়, যা এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যৌনসুখ উপভোগ এবং যৌনসুখ প্রসারের মাধ্যমে চরিতার্থ করবার জন্য উদ্যোগী হতে হয়। এই প্রকার জড়বাদী বিষয়াদি একান্তভাবেই সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির সহায়ক হয় যে, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানেরই নিত্য সেবক মাত্র। অতএব ভাগবতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*জনস্য মোহোঽয়ম্ অহং মমেতি*—জড়জাগতিক মোহমায়ার এই সমস্ত বিষয়াদির দ্বারা উন্মত্ত হয়ে, বদ্ধ জীব উন্মাদের মতো ধারণা পোষণ করে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একমাত্র সে-ই মূলকেন্দ্র এবং যা কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে, তা সবই শুধুমাত্র তারই একান্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য তৈরি হয়েছে। এমন মায়াময় বিভ্রান্তিকর ভোগবৃত্তির পথে যে কেউ অন্তরায় হলেই, সে তৎক্ষণাৎ তার শত্রু হয়ে পড়ে এবং তাকে বধ করবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়।

এই ধরনের দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবনধারায় এবং মায়াবন্ধনের ফলে, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব এবং কাম-ক্রোধ থেকে উৎপন্ন সংঘর্ষে সমগ্র পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে বিচলিত হয়ে রয়েছে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যাঁদের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করাই এই সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে একটি জনপ্রিয় প্রচলিত অভিব্যক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তা হল "শক্তি-ক্ষমতা দুর্নীতি সৃষ্টি করে আর সম্পূর্ণ সার্বিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি ব্যাপ্ত করে থাকে।" জড় জাগতিক স্তরে ঐ ধরনের উপমা কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত, সে কখনই জড়জাগতিক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং ইন্দ্রিয়-উপভোগের আয়োজনে অংশ গ্রহণের চিন্তাও করতে পারে না। তাঁর মন চিরকালই পরিচ্ছন্ন এবং বিনম্র হয়ে থাকে, এবং প্রত্যেকটি জীবের পরম কল্যাণার্থে তিনি নিয়ত সজাগ সতর্ক থাকেন। মানব সমাজে যে সুস্থ মস্তিষ্কের আশু প্রয়োজন রয়েছে, তা জগতের দুর্দশাক্লিষ্ট জীবগণকে জানানোর জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জ্বরাক্রান্ত কোনও মস্তিষ্ক যথার্থ পথনির্দেশ দিতে পারে না, এবং সমাজের চিন্তাশীল মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, তারা যদি স্বার্থ চিন্তায় জর্জরিত হয়ে চলে, তবে তারা জ্বরাক্রান্ত, প্রবল প্রলাপগ্রস্ত মস্তিষ্কের চেয়ে কিছুমাত্র কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে না। প্রলাপগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাগুলি ক্রমশই মানব সমাজে সকল প্রকার সুখশান্তি ধ্বংস করে চলেছে। সুতরাং বৈষ্ণব প্রচারকদের কর্তব্য এই যে, ভাগবতোত্তম পর্যায়ে অবস্থিত হয়ে, কোনওভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে, কিংবা সৎ চরিত্রবান মানুষকে প্রদান করা হতে পারে যিনি কোনও জড়বাদী ঐশ্বর্যের আকর্ষণে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত না হয়ে, মানব সমাজকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিতে পারেন। সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ যাঁরা ভক্তিযোগের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম, তাঁদের অন্ততপক্ষে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তদের স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত এবং তাঁদের পথনির্দেশ গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে মানব সমাজকে এমন সুন্দর সুচারুভাবে সুবিন্যস্ত করা যাবে, যাতে শুধুমাত্র সমস্ত মানুষেরাই নয়, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সবই জীবনধারণে উন্নতি লাভ করতে পারবে এবং ক্রমশই তাদের নিজ নিকেতনে, ভগবদ্ধামে সৎ-চিৎ-আনন্দময় এক জীবন লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সার্থকতা অর্জনে যাঁরা বাস্তবিকই পরমাগ্রহী, তাঁদের পক্ষে বৈষ্ণবদের সমাজে বসবাস করা অবশ্যই কর্তব্য। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও তাঁর

রচনাবলীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের দ্বারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবনাময় সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ না করলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে, মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে যে সমস্ত ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীরা বসবাস করতে পারে, পারমার্থিক জীবনচর্যা শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারিত হয়েছে। গৃহস্থ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ পারমার্থিক পারিবারিক জীবন যাপনের মধ্যেও, মন্দিরের অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত যোগদান করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। যাঁরা পারিবারিক গৃহস্থ জীবন যাপন করেন, তাঁদের প্রত্যহ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা উচিত, তাঁর স্বয়ং অধিষ্ঠানের সামনে তাঁর পবিত্র নামকীর্তন করা দরকার, শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রীর প্রসাদ-অংশমাত্রও সেবন করা প্রয়োজন, এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ প্রবচনাদি শ্রবণ করা আবশ্যক। যে গৃহস্থ ব্যক্তি এই সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনাদির সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়মিতভাবে গ্রহণ করেন, এবং আমিষ-আহার বর্জন, অবৈধ যৌন সংসর্গ বর্জন, জুয়া-তাস-পাশা খেলা বর্জন এবং নেশা-ভাং বর্জন নামক পারমার্থিক ব্রতের বিধিবদ্ধ নিয়মাদি অনুশীলন করতে থাকেন, তাঁকে বৈষ্ণব সমাজের যোগ্য সদস্যরূপে পরিগণিত করা চলে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বিরূপ মানুষদের শ্রীভগবানের মায়াশক্তির হাতে নির্জীব পুতুল বলেই মনে করতে হবে।

শ্লোক ৫১

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

ন—নয়; **যস্য**—যার; **জন্ম**—শুভ জন্ম; **কর্মভ্যাম্**—কিংবা সৎ কর্মাদি; **ন**—না; **বর্ণাশ্রম**—কর্মজীবন কিংবা ধর্মজীবন সম্পর্কিত বিধিনিয়মাদি পালন; **জাতিভিঃ**—কিংবা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হওয়া; **সজ্জতে**—নিজেকে যুক্ত রাখে; **অস্মিন্**—এই (শরীরে); **অহম্-ভাবঃ**—অহমিকাপ্রসূত মনোভাবে; **দেহে**—শরীরে; **বৈ**—অবশ্য; **সঃ**—সে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে; **প্রিয়ঃ**—প্রীতিভাজন হয়।

অনুবাদ

সম্ভ্রান্ত পরিবারগোষ্ঠীতে শুভজন্ম এবং পবিত্র শুদ্ধ ধর্মাচরণের ফলে মানুষের মনে অবশ্যই গর্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনই, যদি কারও পিতা-মাতা বর্ণাশ্রম

সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অতীব উচ্চস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হওয়ার ফলে সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে থাকে, তা হলে তার পক্ষে বিশেষ আত্মরক্তিতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের বিশেষ জড়জাগতিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিন্দুমাত্রও অহমিকা বোধ না করে, তা হলে তাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম প্রীতিভাজন রূপে মান্য করতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, 'জন্ম' শব্দটি *মূর্ধাবসিক্তস্* (ব্রাহ্মণ-পিতা ও ক্ষত্রিয়-মাতার সন্তানাদি) এবং *অম্বষ্ঠস্* (ব্রাহ্মণ-পিতা ও বৈশ্য-মাতার সন্তানাদি) শ্রেণীর মানুষদের বোঝায়, উভয়কেই *অনুলোম* সন্তানাদি বলা হয়, যেহেতু পিতা উচ্চবর্ণজাত মানুষ। যে-বিবাহসূত্রে পিতার চেয়ে মাতা কোনও উচ্চশ্রেণীজাত হন, সেক্ষেত্রে বিবাহটিকে প্রতিলোম বলা হয়ে থাকে। যাই হোক, কেউ যখন তার সম্ভ্রান্ত জন্মসূত্র বলতে যা বোঝায়, তার ফলে অহঙ্কার বোধ করে, তখন অবশ্যই সে দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ভাবধারায় আক্রান্ত হয়েছে মনে করতে হবে, অর্থাৎ তার দেহবিষয়ক পরিচিতিকেই সে আত্ম-পরিচয় জ্ঞান করেছে। পার্থিব জড় দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে এমনই বিপুল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, যার সমাধান একমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। জড়জাগতিক সম্ভ্রান্ত বংশের শরীর বলতে যা বোঝায়, তারই ফলে তার স্বর্ণশৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমতে, কনিষ্ঠ অধিকারীরা মনে করে যে, কর্মমিশ্রা ভক্তি তথা বস্তুবাদী কর্ম প্রচেষ্টার সাথেই ভগবদ্ভক্তির মিশ্রণ করে চলাই পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য। তারা এই ধরনের শ্লোকাবলীর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে থাকে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

"বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে নির্ধারিত কর্তব্যকর্মগুলি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার অন্য কোনও পন্থা নেই। চারি বর্ণাশ্রমের প্রথার মধ্যেই কর্তব্যপরায়ণ হয়ে মানুষকে চলতেই হবে।" (*বিষ্ণুপুরাণ* ৩/৮/৯) সুতরাং ঐ সব মানুষ মনে করে যে, জড়জাগতিক কাজকর্মের যে অংশটির ফলশ্রুতি শ্রীভগবানকে অর্পণ করা হয়, তা থেকেই মানব জীবনের সর্বোত্তম সিদ্ধির স্তর লাভ করা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, বিভিন্ন

স্মৃতিশাস্ত্রেও এই ধরনের মিশ্র ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বস্তুবাদী ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীভগবানের পবিত্র নামের অবমাননা করার উদ্দেশ্যেই ঐ সমস্ত গ্রন্থ মেনে চলে, যেহেতু জড়জাগতিক শরীরের প্রতি তাদের আত্মম্ভরী আসক্তি রয়ে গেছে। তাই অনেকে মনে করে যে, জন্মসূত্রে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে মর্যাদার অবস্থান থাকলে এবং ধর্মাচরণ বলতে যা বোঝায় সেইগুলি পালন করলেই জীবনে সার্থকতা লাভ করা চলে।

তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের যথার্থই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা কখনই এই জড়জগতে তাঁদের জন্ম মর্যাদা নিয়ে গর্ব করেন না, কিংবা বস্তুবাদী কাজকর্মের তাঁদের দক্ষতা বলতে যা বোঝায়, তা নিয়ে অহঙ্কার করেন না। যতক্ষণ মানুষের মন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বস্তুবাদী পরিচিতির দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ জড়জাগতিক বন্ধনদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে শ্রীভগবানের প্রিয়জনরূপে প্রতিষ্ঠিত করার নিতান্তই অল্প সুযোগ থাকে। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি নিজেকে মহাপ্রাজ্ঞ যাজক পূজারী, শ্রীভগবানের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যাপৃত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কিংবা শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত কঠোর পরিশ্রমী কর্মী, এমন কোনও পরিচয়ের দ্বারা সুবিদিত করতে অভিলাষী নন। এমন কি, স্থিরসঙ্কল্প নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, উদারপ্রাণ গৃহস্থ, অথবা মহিমান্বিত এক সন্ন্যাসী বলেও নিজেকে পরিচিত করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পারেন নি এই সমস্ত আত্মপরিচয়গুলি থেকে এমন বস্তুবাদী অহমিকা প্রতিফলিত হয়, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন সুসম্পন্ন করার কাজে যা দূষণ সৃষ্টি করতে থাকে। কোনও ভক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সর্বজনস্বীকৃত কর্তব্যকর্মগুলি সম্পন্ন করে চলতে থাকলেও, তার একমাত্র পরিচয় *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ*, গোপীগণের ভর্তা তথা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের দাসের দাসেরও নিত্যকালের দাস মাত্র।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, যখন ভক্ত বুঝতে পারে যে, ভক্তিযোগের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে এবং শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে সে মগ্ন হয়েছে, তখনই পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবান স্নেহভরে সেই রকম কোন শ্রেষ্ঠ ভক্তকে তাঁর আপন স্নেহাশ্রিত ক্রোড়ে স্থাপনা করেন। পরমেশ্বর ভগবান কেবলমাত্র নির্মল ভক্তির মাধ্যমেই প্রীতিলাভ করতে পারেন, এবং কোনও প্রকার পঞ্চভূত তথা জড়জাগতিক পঞ্চবিধ উপাদানের মাধ্যমে সৃষ্ট স্থূল দেহটির কোনও আয়োজনের মাধ্যমে, কিংবা অসংখ্য কল্পনা আর ভিত্তিহীন আত্মরতিতা নিয়ে গড়ে ওঠা কোনও সূক্ষ্ম আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে তিনি সন্তুষ্ট হন

না। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষের নানা আভিজাত্যপূর্ণ শরীর বলতে যা বোঝায়, যেটি কীটপতঙ্গ কিংবা শকুনের ভক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে, কখনই শ্রীকৃষ্ণ তার দ্বারা প্রীতিলাভ করতে পারেন না। যদি কেউ তার জড়জাগতিক জন্মসূত্রে গর্ববোধ করতে থাকে এবং ধর্মাচরণমূলক ক্রিয়াকর্ম বলতে যা বোঝায়, সেই সকল বিষয়ে অহংকার করে, তবে ঐ ধরনের মিথ্যা ভাব-আড়ম্বরের ফলে, মানুষ ক্রমশই কর্মফল বর্জনের নিছক নিরাকার নির্বিশেষবাদী মানসিকতা গড়ে তোলে যেন সে কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করছে, কিংবা কর্মফল উপভোগের কর্মীসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় অভিব্যক্ত করতে থাকে। কর্মীরা কিংবা জ্ঞানীরা তাদের কষ্টকল্পনার মাধ্যমে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, সকল কর্মেরই ফল বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণেরই। পরিশেষে বলতে হবে যে, মানুষকে তার সমস্ত অহঙ্কার বর্জন করতে হবে এবং সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নগণ্য দাস মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।*

শ্লোক ৫২

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা ।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

নঃ—থাকে না; **যস্য**—যার; **স্বঃ পরঃ ইতি**—'আমার' এবং 'অন্যের'; **বিত্তেষু**—তার ধনসম্পদের; **আত্মনি**—নিজের শরীরের; **বা**—অথবা; **ভিদা**—ভেদ-দর্শনের ফলে; **সর্বভূতঃ**—সকল জীবের; **সমঃ**—সর্বত্র সমদর্শী; **শান্তঃ**—রাগদ্বেষ বর্জিত; **সঃ**—যিনি; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবত-উত্তমঃ**—শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ

যে সমস্ত স্বার্থচিন্তার মাধ্যমে মানুষ মনে করে "এটা আমার সম্পত্তি, আর ওটা তার", সেই সমস্ত ভাবনা যখন কোনও ভগবদ্ভক্ত বর্জন করেন, এবং যখন তিনি তাঁর নিজের পার্থিব দেহটির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ বিধানের ব্যাপারে আর আগ্রহী হন না কিংবা অন্যেরও অস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে বিমুখ থাকেন না, তখন তিনি পরিপূর্ণ শান্তিময় এবং সুখময় হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে অন্য সকল জীবেরই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন। এমনই তৃপ্তিময় বৈষ্ণবকে ভগবদ্ভক্তির পরম উৎকর্ষতার নিদর্শন বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সর্বভূতসমঃ শব্দসমষ্টি দ্বারা যে-ভাবটি বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ "সকল জীবকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করা", তার মধ্যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দর্শন প্রসঙ্গ আসছে

না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* গ্রন্থ থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ন ক্বাপি জীবং বিষ্ণুত্বে সংশৃতৌ মোক্ষ এব চ

"কোনও পরিস্থিতিতেই, বদ্ধ জীবনেই হোক কিংবা মুক্তি প্রাপ্ত জীবনেই হোক, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কখনই কোনও জীবের সমকক্ষ মনে করা চলে না।" নিরাকার নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা কল্পনা করতে ভালবাসেন যে, ইহজীবনে বর্তমান শরীরে যদিও মায়াবশত আমরা নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাবিশিষ্ট জীব বলে মনে করে থাকি, মুক্তি লাভ করলে অবশ্য আমরা সকলেই শ্রীভগবানের সত্ত্বায় মিশে যাব এবং ভগবান হয়ে যাব। এই ধরনের কষ্টকল্পনাবিলাসীরা যথাযথভাবে বোঝাতেই পারে না কেমন করে সর্বশক্তিমান ভগবান একটা যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে প্রবেশ করবার মতো অসম্মানজনক মর্যাদাহীনতা মেনে নিতে পারবেন, সেখানে সাপ্তাহিক দক্ষিণা দেবেন, তাঁর নাকটি চেপে ধরে যোগ-মন্ত্র উচ্চারণের তালিম দেবেন যাতে নাকি তিনি তাঁর দিব্য সত্ত্বা আবার পুনরুদ্ধার করতে পারেন। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনাঃ চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।* জীবসত্ত্বার বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ কিংবা সমষ্টিরূপ পার্থিব অস্তিত্বের সৃষ্টি নয়। *নিত্যানাং* শব্দটি নিত্য সত্ত্বাবিশিষ্ট জীবের বহুত্ব গুণটি ব্যক্ত করার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ করছে যে, জীবগণ নিত্যকালই *একঃ* বিশেষণে এখানে বর্ণিত একমাত্র তুলনাহীন সত্ত্বারূপে শ্রীভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে। *ভগবদ্গীতায়* (১/২১) শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেন, *রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*—"হে প্রিয় অচ্যুত, শত্রুবাহিনীর সামনে আমার রথটি নিয়ে চল।" এই শরীরটিও রথ বিশেষ, একটি চলমান যান, এবং তাই সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হল এই যে, রথস্বরূপ আমাদের পার্থিব বদ্ধ শরীরটিকে অচ্যুত ভগবানের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্পণের অনুরোধ জানানো উচিত এবং সেইভাবেই ভগবদ্ধামের পথে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করা উচিত। *অচ্যুত* শব্দটির অর্থ 'অক্ষয়' অর্থাৎ 'কখনও যাঁর পতন হয় না'। যথার্থ জ্ঞানী অর্থাৎ সুস্থ মানুষ কখনই নির্বোধের মতো মেনে নেবেন না যে, মায়ার প্রভাবে সর্বশক্তিমান, সর্বৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের পদস্খলন এবং পতন হয়েছে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমাদের নিত্য দাসত্ব কোনও প্রকারে কষ্টকল্পনার দ্বারাই নস্যাৎ করতে পারে না।

বরাহপুরাণে শ্রীভগবান স্বয়ং এই সত্যটি বর্ণনা করেছেন—

নৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং জীবাত্মাহম্ ইতি ক্বচিৎ।
সর্বৈর্গুণৈর্সুসম্পন্নং দৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি ॥

"তোমরা আমাকে কখনই জীব শ্রেণীর সাধারণ প্রাণিকুলের একজন মনে কর না। প্রকৃতপক্ষে, আমি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বরিক গুণাবলীর উৎস, এবং তাই তোমাদের বোঝা উচিত যে, আমিই পরমেশ্বর ভগবান।"

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি শ্রীভগবানের সেবায় কোনও বিশেষ বস্তুসামগ্রীর উপযোগ নিষিদ্ধ করেনি, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোনও ভক্ত স্বচ্ছন্দে যে কোনও অনুকূল সামগ্রী ব্যবহার করতেই পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এইভাবে অনুকূল সামগ্রী উপযোগের নামই *যুক্তবৈরাগ্য*। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে* শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ্যে সবকিছুর প্রয়োগ উপযোগ করা উচিত—কখনই কোন কিছুই নিজস্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কেউ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলে যে, কোনও পার্থিব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল হলেও সেই বস্তুটিকে আয়ত্তাধীন করতে প্রয়াসী হওয়া অনুচিত, তা হলে সে *ফল্গু-বৈরাগ্য* নামে অভিহিত বিভ্রান্তির কবলায়িত হয়ে পড়ে। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মহান নৃপতিরা সমগ্র পৃথিবীকে, এবং অন্য সকল বৈষ্ণবদেরও সকলেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তবে তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই তাঁদের নিজ কর্তৃত্ববোধ বর্জন করেছিলেন। সেই বিষয়টিই এই শ্লোকটিতে আলোচিত হয়েছে। মানুষ যেমন নিজের দেহের কোনও যন্ত্রণায় খুব অস্থির হয়, তেমনই বদ্ধ জীবদেরও ভগবদ্ভক্তির স্তরে নিয়ে আসার জন্য মনোবেদনায় কাতর হতে হয়, যাতে তাদের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা চিরতরে দূর হয়ে যায়। একটি শরীর এবং অন্য একটি শরীরের মধ্যে ভেদবিচার না করার সেটাই যথার্থ তাৎপর্য।

শ্লোক ৫৩

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্ল-
বনিমিষার্ধ মপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্রি-ভুবন—বস্তুবাদী জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনটি গ্রহলোকমণ্ডলী; **বিভব-হেতবে**—ত্রিলোকের সমগ্র ঐশ্বর্যের ফলে; **অপি**—যদিও; **অকুণ্ঠ-স্মৃতিঃ**—যাঁর স্মৃতিক্ষমতা অকুণ্ঠিত; **অজিত-আত্মা**—অজেয় পরমেশ্বরই যাঁর আত্মা; **সুর-আদিভিঃ**—দেবতাগণ এবং অন্যান্যেরা; **বিমৃগ্যাৎ**—আকাঙ্ক্ষিত; **ন চলতি**—চলে যায় না; **ভগবৎ**—পরম

পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের; **পদ-অরবিন্দাৎ**—পাদপদ্ম থেকে; **লব**—সামান্য ভগ্নাংশ (এক মুহূর্তের ৮/৪৫ অংশ); **নিমিষ**—অথবা তার তিনগুণ; **অর্ধম্**—অর্ধেক; **অপি**—এমন কি; **যঃ**—যে; **সঃ**—সে; **বৈষ্ণব-অগ্র্যঃ**—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিজেদের জীবাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ মহান দেবতাগণও সেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল অভিলাষ করে থাকেন। সেই চরণকমল কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কোনও অবস্থায় কখনই বিস্মৃত হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার এবং উপভোগের আশীর্বাদ লাভেরও বিনিময়ে কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় ত্যাগ করবে না। তেমন ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে গণ্য হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতেও পারে, "যদি কোনও মানুষ অর্ধ মুহূর্তের জন্যও শ্রীভগবানের চরণপদ্মাশ্রয় ত্যাগ করে তার পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য লাভে সক্ষম হতে পারে, তা হলে ঐ সামান্য মুহূর্তের জন্য শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম ত্যাগ করার ফলে কী এমন ক্ষতি হতে পারে?" *অকুণ্ঠস্মৃতি* শব্দসমষ্টির মাধ্যমে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল ভুলে থাকা একান্তই অসম্ভব, যেহেতু যা কিছুর অস্তিত্ব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা সবই পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশপ্রকাশ মাত্র। যেহেতু কোনও কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়, তাই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবান ভিন্ন কোনও কিছুই চিন্তা করতে পারেন না। তা ছাড়া কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার কিংবা উপভোগের চিন্তাও করতে পারেন না, যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ঐশ্বর্যরাশি তাঁকে প্রদান করা হয়, তা হলেও তৎক্ষণাৎ সেই সবই তিনি শ্রীভগবৎ-চরণে নিবেদন করবেন এবং নিজে একান্ত ভগবৎ-সেবকেরই মর্যাদায় ফিরে যাবেন।

এই শ্লোকটির মধ্যে *অজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ* শব্দসমষ্টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচরণ কমল এমনই ঐশ্বর্যময় যে, সকল জাগতিক ঐশ্বর্যের অধিপতি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো দেবতারা, এমন কি অন্যান্য দেবতারাও, সদাসর্বদা শ্রীভগবানের চরণপদ্মের ক্ষণিক দর্শন লাভের প্রত্যাশায় নিত্য আরাধনা করে থাকেন। *বিমৃগ্যাৎ* শব্দটি বোঝায় যে, দেবতারা বাস্তবিকই শ্রীভগবৎ-চরণকমলের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হন না, তবে তাঁরা তা দর্শনের প্রয়াসী হয়েই থাকেন। এই বিষয়ে দশম স্কন্ধে একটি দৃষ্টান্ত সহকারে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে নানা দুর্বিপাক নিরসনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ব্রহ্মা প্রার্থনা নিবেদন করেন।

এই ধরনেরই একটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/১৪/১৪) অন্যত্র দেখা যায়—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

"যে ভক্ত আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করেছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কোনও ব্রহ্মাপদ, ইন্দ্রপদ, সার্বভৌম অর্থাৎ সমগ্র ভূমণ্ডলের সর্বময় কর্তার পদ, পাতাল রাজ্যের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি কিংবা পুনর্জন্ম লাভের আবর্তচক্র থেকে মোক্ষলাভ করতেও ইচ্ছা করেন না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমতে, *অজিতাত্মা* শব্দটির দ্বারা *অজিতেন্দ্রিয়াঃ* অর্থাৎ "যাঁর ইন্দ্রিয়াদি অনিয়ন্ত্রিত" বোঝানো যেতেও পারে। যদিও দেবতাগণ সকলকেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরূপে পূজা করা হয়ে থাকে, তা হলেও উচ্চতর গ্রহলোক ব্যবস্থায় জড়জাগতিক দুঃখকষ্টের অনুপস্থিতির ফলে তাঁরা সচরাচর দেহাত্মবোধে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, এবং অনেক সময়ে তাঁরা তাঁদের কাছে সহজলভ্য বিপুল পরিমাণ জড় জাগতিক সুখসুবিধা থাকার ফলে, তাঁদের পক্ষে কিছু পারমার্থিক অসুবিধার অভিজ্ঞতা হতে থাকে। এই শ্লোকটিতে *অকুণ্ঠস্মৃতি* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মনের মধ্যে অবশ্য তেমন কোনও দ্বন্দ্ব বিভ্রাট ঘটতে পারে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও গ্রহলোক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার পার্থিব জড় জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনটিই যেহেতু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, সেই কারণে তেমন ভক্তের কখনই সম্ভবত কোনও পতন হয় না কিংবা ভগবৎ-সেবায় তাঁকে পরাঙ্মুখ হতে হয় না।

শ্লোক ৫৪

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে ।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

ভগবতঃ—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **উরু-বিক্রম**—মহাবিক্রমশালী; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্ম; **শাখা**—অঙ্গুলিসমূহ; **নখ**—নখাদি; **মণি**—মণিরত্নের মতো; **চন্দ্রিকয়া**—চন্দ্রালোকে;

নিরস্ত-তাপে—কামাদি সন্তাপ থেকে নিরস্ত হয়ে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কথম্**—কিভাবে; **উপসীদতাম্**—উপাসনারত; **পুনঃ**—পুনরায়; **সঃ**—সেই সন্তাপ; **প্রভবতি**—উদয় হতে পারে; **চন্দ্রে**—যখন চন্দ্র; **ইব**—এমন; **উদিতে**—উদিত হয়; **অর্ক**—সূর্যের; **তাপঃ**—প্রখর কামাদিতাপ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁর হৃদয়মাঝে জড় জাগতিক সন্তাপ যন্ত্রণা থাকতে পারে কেমন করে? শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অগণিত মহাবিক্রমপূর্ণ কার্য সমাধা করেছেন, এবং তাঁর শ্রীচরণাগ্রের সুন্দর নখগুলি মহার্ঘ্য মণিরত্নসম। ঐ নখাগ্র থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশীতল চন্দ্রালোকেরই মতো, শুদ্ধভক্তের হৃদয়-সন্তাপ অচিরেই দূর করে, যেমন চন্দ্রের সুশীতল কিরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপযন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

তাৎপর্য

যখন চন্দ্রোদয় হয়, তখন তার আলোক বিচ্ছুরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপজনিত যন্ত্রণার উপশম হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মের নখপদ্মগুলি থেকে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ কিরণ যেন ভগবদ্ভক্তের সকল সন্তাপ বিদূরিত করে। বৈষ্ণব ভাষ্যকারদের মতানুসারে এই শ্লোকটি থেকে বুঝতে হবে যে, অদম্য কামবাসনার দ্বারা প্রজ্বলিত জড়জাগতিক কামনা যেন জ্বলন্ত আগুনের মতো যাতনাময়। এই আগুনের শিখায় বদ্ধজীবের সুখ-শান্তি ভস্মীভূত হয়ে যায়, তার ফলে সে এই অসহনীয় অগ্নি নির্বাপণের ব্যর্থ সংগ্রামে ৮৪,০০,০০০ জন্মযোনির মধ্যে নিরন্তর আবর্তিত হতে থাকে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের অন্তস্তলে শ্রীভগবানের স্নিগ্ধ মণিসম চরণপদ্মযুগল ধারণ করে থাকেন, এবং তাতেই সমস্ত পার্থিব অস্তিত্বের ব্যথা-যন্ত্রণা নির্বাপিত হয়ে যায়।

উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শব্দটি বোঝায় যে, ভগবৎ-পাদপদ্ম বিপুল বিক্রমশালী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খর্বকায় ব্রাহ্মণরূপী বামন অবতার লীলার জন্য প্রখ্যাত; ঐ বামন অবতাররূপে তিনি তাঁর সুদৃশ্য নখাগ্রগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে প্রেরণ করেছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, যার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা তিনি নিয়ে এসেছিলেন। তেমনভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ যখন দৈত্যসম রাজা কংসকে সম্মুখসমরে আহ্বানের উদ্দেশ্যে মথুরা নগরীতে প্রবেশ করছিলেন এবং কুবলয়াপীড় নামে এক দুর্দান্ত হাতির দ্বারা তাঁর প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে হাতিটিকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন এবং শান্তভাবে নগরদ্বার দিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম এমনই মহান

যে, বৈদিক শাস্ত্রাদিতে সমগ্র জড়জাগতিক সৃষ্টিকেই তাঁর চরণপদ্মের অধীন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—*সমাশ্রিতা যে পদপল্লব প্লবং মহৎ পদং পুণ্যযশো মুরারেঃ* (*ভাগবত* ১০/১৪/৫৮)।

শ্লোক ৫৫

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্-
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৫৫ ॥

বিসৃজতি—পরিত্যাগ করেন; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ন**—কখনও না; **যস্য**—যার; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **অবশ**—অনবধানতায়; **অভিহিতঃ**—বলা হয়; **অপি**—যদিও; **অঘ**—পাপের; **ওঘ**—প্রচুর; **নাশঃ**—নাশ করেন; **প্রণয়**—প্রেম; **রসনয়া**—রশির দ্বারা; **ধৃত**—আবদ্ধ; **অঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ**—তাঁর পদকমল; **সঃ**—তিনি; **ভবতি**—হন; **ভাগবতপ্রধানঃ**—শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; **উক্ত**—কথিত।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বদ্ধ জীবগণের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের মাধ্যমে যদি তাঁকে অনিচ্ছায় কিংবা অনবধানতায় আহ্বান করা হয়, তা হলে তাদের অন্তরের অগণিত পাপময় কর্মফল বিনাশে তিনি উদ্যোগী হন। সুতরাং, যখনই কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় স্বীকার করেন এবং যথার্থ প্রেমভক্তিসহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তেমন ভক্তজনের হৃদয়াসন পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন না। এইভাবে অনায়াসে যিনি তাঁর হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানকে ধারণ করে রেখেছেন, তাঁকেই ভাগবতপ্রধান, তথা শ্রীভগবানের মহত্তম ভক্তরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের গুণাবলীর সারাৎসার এই শ্লোকটির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত তাঁকেই বলা হয় যিনি তাঁর ভগবৎ-প্রেমের আকর্ষণে শ্রীভগবানকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছেন যে, ভগবান কোনও ক্রমেই ভক্তের হৃদয় ত্যাগ করতে পারেন না। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই শ্লোকে *সাক্ষাৎ* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পরম সম্যক্ সৌন্দর্য সমেত ষড়ৈশ্বর্যে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত মনপ্রাণ নিবেদন করে শুদ্ধ

ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে হৃদয় সমর্পণ করার ফলে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন। কোনও শুদ্ধ ভক্ত কখনই নারীর বক্ষের মাংসপিণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হন না কিংবা পার্থিব জগতের মাঝে সমাজ, সখ্যতা এবং ভালবাসার নামে রকমারী বিভ্রান্তির দ্বারা বিচলিত হন না। তাই তাঁর নির্মল হৃদয়খানি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ নিবাস হয়ে ওঠে। যে কোনও ভদ্রলোক শুধুমাত্র পরিচ্ছন্ন জায়গাতেই বাস করে থাকেন। তিনি কখনই দূষিত বিষাক্ত পরিবেশে থাকবেন না। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা এখন অনেকেই বিপুল পরিমাণে জল এবং বায়ু প্রদুষিত শহরের শিল্প উদ্যোগগুলির দ্বারা পরিদূষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় বসবাসের অধিকার পাওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে। ঠিক তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভদ্রলোক, এবং তাই তিনি কোনও দূষিত হৃদয়মাঝে থাকবেন না, কিংবা বদ্ধ জীবের দূষিত মনের মধ্যেও অবস্থান করবেন না। যখন ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রেমিক হয়ে যান, তখন শ্রীভগবান সেই ধরনের কোনও শুদ্ধভক্তের পবিত্র হৃদয় এবং মনের মধ্যে তাঁর আসন পাতেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *য এতাদৃশ প্রণয়বাংস তেনানেন তু সর্বদা পরমাবশেনৈব কীর্ত্যমানঃ সুতরামেবং এবাঘৌঘনাশঃ স্যাৎ*। যদি কোনও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময় দিব্য সেবায় মগ্ন থাকেন, তা হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি নিয়ত দিব্য প্রেমভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁকে মহিমান্বিত করতে থাকেন। সুতরাং, যদিও তিনি শ্রীভগবানের সেবায় মগ্ন থাকার ফলে অমনোযোগ সহকারেও শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করতে থাকেন, তা হলেও ভগবৎ-কৃপায় তাঁর অন্তর থেকে সকল পাপকর্মের ফল পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/১১) বলা হয়েছে—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

"হে রাজন্! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধিলাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমন কি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সব রকম জড়জাগতিক পার্থিব সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত এবং যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই এটিই সিদ্ধি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।" সুতরাং কেউ যদি প্রেমময় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পর্যায়ে উপনীত হতে

না পারে, তবে শুধুমাত্র পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে থাকলেই সে ক্রমশ সকল পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে থাকবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে, অজামিলের কাহিনীর তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—কিভাবে সামান্য এক মানুষকেও পবিত্র ভগবানের নাম পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়। মাতা যশোদা শিশুকৃষ্ণকে একখণ্ড দড়ি দিয়ে উদুখলের সাথে বেঁধে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকুলের অচিন্তনীয় প্রেমাকর্ষণে অভিভূত হয়ে নিজেকে বন্ধনে আবদ্ধ হতে সুযোগ দেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমস্ত বদ্ধ জীবকে তাঁরই মায়াবন্ধনে আবদ্ধ রাখেন, কিন্তু ঐ বদ্ধ জীবেরাই যদি শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠে, তা হলে তারাই আবার শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎ-প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, সমস্ত জগতের পাপময় অশুভ প্রভাব মুহূর্তের মধ্যে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে দূর হয়ে যেতে পারে। যারা সব রকমের পাপাচরণ ত্যাগ করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তাদের অন্তর হতে চলে যান না। ঐ জপকীর্তন তেমন সুচারুভাবে সম্পন্ন না হলেও, যে সকল ভক্ত সদাসর্বদা শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা ক্রমশই প্রেমনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির অবিচল পর্যায়ে উন্নীত হবেন। তখন তাঁদের *মহাভাগবত*, অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বলা যাবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।